وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-١٠٣)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-٣١٨)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক আল-ই‘তিছাম

الاعتصام

আবূ কাতাদা رضي الله عنه হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘আমি আল্লাহ তাআলার নিকট আরাফাতের দিনের ছিয়াম সম্পর্কে আশা করি যে, তিনি এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী এক বছর এবং পরবর্তী এক বছরের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন’ (ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬২)।

●৭ম বর্ষ ●৮ম সংখ্যা ●জুন ২০২৩

Web : www.al-itisam.com

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلي الاعتصام بالكتاب و السنة.

السنة:٧، ذو القعدة و ذو الحجة ١٤٤٤هـ/ يونيو ٢٠٢٣م العدد:٨، الجزء : ٨٠

تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش

رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن يوسف

التحرير و التنسيق: لجنة البحوث العلمية لمجلة الاعتصام

Monthly AL-ITISAM

Chief Editor : **SHEIKH ABDUR RAZZAK BIN YOUSUF**

Overall Editing : **AL-ITISAM RESEARCH BOARD**

Published By : AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH, NARAYANGONJ AND RAJSHAHI, BANGLADESH.

Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM, Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi;
Tuba Pustakalay, Nawdapara (Amchattar), P.O. Sapura, Rajshahi-6203

Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840 E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

প্রচ্ছদ পরিচিতি

গ্র্যান্ড জামিয়া মসজিদ, লাহোর, পাকিস্তান : লাহোরের বাহরিয়া টাউনে অবস্থিত বিশ্বের ৭ম বৃহত্তম মসজিদটি ২০১৪ সালে নির্মিত হয়। মসজিদটিতে একসাথে ৭০০০০ মুছল্লী ছালাত আদায় করতে পারে। মসজিদটিতে ১৬৫ ফুট উচ্চতার ৪টি মিনার, একটি সুবিশাল গম্বুজ ছাড়াও মূল আঙিনায় একটি সুদৃশ্য ঝর্ণা রয়েছে। মসজিদ কমপ্লেক্সে মহিলাদের ছালাতের স্থান, মাদরাসা, লাইব্রেরি ও মুসলিম ঐতিহ্য সমৃদ্ধ একটি জাদুঘর রয়েছে।

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪৪ ‖ ঈসায়ী ২০২৩ ‖ বঙ্গীয় ১৪৩০

ইংরেজি মাস	আরবী মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১ জুন	১১ যুলক্বা'দাহ	বৃহস্পতিবার	০৩:৪৫	০৫:১০	১১:৫৬	০৩:১৬	০৬:৪২	০৮:০৮
০৫ ,,	১৫ ,,	সোমবার	০৩:৪৪	০৫:১০	১১:৫৭	০৩:১৬	০৬:৪৪	০৮:১০
১০ ,,	২০ ,,	শনিবার	০৩:৪৩	০৫:১০	১১:৫৮	০৩:১৭	০৬:৪৬	০৮:১২
১৫ ,,	২৫ ,,	বৃহস্পতিবার	০৩:৪৩	০৫:১০	১১:৫৯	০৩:১৭	০৬:৪৮	০৮:১৪
২০ ,,	০১ যুলহিজ্জা	মঙ্গলবার	০৩:৪৪	০৫:১১	১২:০০	০৩:১৮	০৬:৪৯	০৮:১৬
২৫ ,,	০৬ ,,	রবিবার	০৩:৪৫	০৫:১২	১২:০১	০৩:১৯	০৬:৫০	০৮:১৭

সূত্র : মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Science, Karachi

জেলাভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
গাজীপুর	-১	০	০
নারায়ণগঞ্জ	০	০	-১
নরসিংদী	-২	-১	-১
কিশোরগঞ্জ	-৪	-২	০
টাঙ্গাইল	০	+১	+৩
ফরিদপুর	+৩	+৩	+২
রাজবাড়ী	+৩	+৪	+৩
মুন্সিগঞ্জ	০	+১	-১
গোপালগঞ্জ	+৪	+৫	+১
মাদারীপুর	+২	+৩	-১
মানিকগঞ্জ	+১	+২	+২
শরিয়তপুর	+২	+২	-১

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
ময়মনসিংহ	-৩	-২	+২
শেরপুর	-৩	-১	+৪
জামালপুর	-২	০	+৪
নেত্রকোনা	-৫	-৩	+১

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
চট্টগ্রাম	-২	-২	-৯
কক্সবাজার	০	-১	-১১
খাগড়াছড়ি	-৫	-৫	-৮
রাঙ্গামাটি	-৪	-৫	-১০
বান্দরবান	-৩	-৪	-১০
কুমিল্লা	-২	-২	-৪
নোয়াখালী	০	০	-৫
লক্ষীপুর	+১	+৩	+৪
চাঁদপুর	০	+১	-২
ফেনী	-২	-২	-৬
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৪	-৩	-৩

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
সিলেট	-১০	-৮	-৪
সুনামগঞ্জ	-৮	-৬	-১
মৌলভীবাজার	-৮	-৭	-৪
হবিগঞ্জ	-৬	-৫	-৩

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রাজশাহী	+৫	+৬	+৮
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৬	+৭	+১০
নাটোর	+৩	+৫	+৭
পাবনা	+৪	+৪	+৫
সিরাজগঞ্জ	০	+২	+৪
বগুড়া	০	+২	+৬
নওগাঁ	+২	+৪	+৮
জয়পুরহাট	+১	+৩	+৮

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রংপুর	-২	+১	+৯
দিনাজপুর	+১	+৩	+১১
গাইবান্ধা	-২	০	+৭
কুড়িগ্রাম	-৪	-১	+৭
লালমনিরহাট	-৩	-১	+৯
নীলফামারী	-১	+২	+১১
পঞ্চগড়	-১	+২	+১৩
ঠাকুরগাঁও	০	+৩	+১৩

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
খুলনা	+৬	+৬	+২
বাগেরহাট	+৬	+৫	০
সাতক্ষীরা	+৮	+৮	+৩
যশোর	+৬	+৭	+৪
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৭	+৬
ঝিনাইদহ	+৫	+৬	+৪
কুষ্টিয়া	+৪	+৫	+৫
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭
মাগুরা	+৫	+৫	+৩
নড়াইল	+৫	+৫	+২

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
বরিশাল	+৩	+৩	-২
পটুয়াখালী	+৪	+৪	-৩
পিরোজপুর	+৫	+৫	-১
ঝালকাঠি	+৪	+৪	-১
ভোলা	+২	+২	-৩
বরগুনা	+৬	+৫	-২

৭ম বর্ষ
৮ম সংখ্যা
জুন ২০২৩
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪৩০
যুলক্বা'দাহ-যুলহিজ্জাহ
১৪৪৪

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

প্রধান সম্পাদক

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

সার্বিক সম্পাদনায়

আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ

সার্বিক যোগাযোগ

মাসিক আল-ইতিছাম

- প্রধান সম্পাদক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী; তুবা পুস্তকালয়, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
- সম্পাদনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৮
- ব্যবস্থাপনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৯
- সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪০
- ফাতাওয়া হটলাইন : ০১৪০৭-০২১৮৪২ (সকাল ৮:০০মি. থেকে সকাল ১০:০০মি.)
- ই-মেইল : monthlyalitisam@gmail.com
- ওয়েবসাইট : www.al-itisam.com
- ফেসবুক পেজ : facebook.com/alitisam2016
- ইউটিউব : youtube.com/c/alitisamtv

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

- জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ : ০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮, ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
- জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী : ০১৪০৭-০২১৮২২
- জামি'আহর উভয় শাখার জন্য : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭, ০১৭১৭-৯৪৩১৯৬
- জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে :
  বিকাশ পারসোনাল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭
  বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

হাদিয়া

৩০/- (ত্রিশ টাকা) মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	ষাণ্মাসিক	বাৎসরিক
সাধারণ ডাক	২২৫/-	৪৫০/-
কুরিয়ার সার্ভিস	৪০০/-	৮০০/-

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ কর্তৃক প্রকাশিত এবং আল-ইতিছাম প্রিন্টিং প্রেস, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

◈ সম্পাদকীয় ০২

◈ দারসে হাদীছ
» যে আমলে জান্নাত লাভ নিশ্চিত হতে পারে! ০৩
-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

◈ প্রবন্ধ
» আল্লাহর দিকে দাওয়াত : দলীয় মোড়কে নাকি পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে? (পর্ব-১৩) ০৭
মূল : আলী ইবনে হাসান আল-হালাবী আল-আছারী
অনুবাদ : আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

» অহীর বাস্তবতা বিশ্লেষণ-১৯তম পর্ব (মিন্নাতুল বারী-২৬তম পর্ব) ১০
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

» কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ঈমানের আলো ও মুনাফেক্বীর অন্ধকার (পর্ব-৩) ১৪
মূল : ড. সাঈদ ইবনু আলী ইবনু ওয়াহাফ আল-ক্বাহত্বানী রাহিমাহুল্লাহ
অনুবাদ : হাফীযুর রহমান বিন দিলজার হোসাইন

» কুরআন ও বিজ্ঞানের আলোকে চোখের গুরুত্ব (পূর্ব প্রকাশিতের পর) ১৬
-মো. হারুনুর রশিদ

» কুরবানীর হাট : প্রাসঙ্গিক কিছু কথা, করণীয় ও বর্জনীয় ১৮
-শেখ আহসান উদ্দীন

» প্যারেন্টিং কী, কেন এবং কীভাবে? ২০
-মো. হাসিম আলী

» ঈদুল আযহা : করণীয় ও বর্জনীয় ২৩
-আবূ লাবীবা মুহাম্মাদ মাকছুদ

» মুমিনগণ মৌমাছির মতো ২৮
-মেরাজুল ইসলাম

» কবি নজরুল ও তাঁর ইসলামী চিন্তাধারা ৩০
-মো. আকরাম হোসেন

◈ ঈদুল ফিতরের খুৎবা
» ঈদ উৎসব : আনন্দ-উল্লাস প্রকাশের কতিপয় শিষ্টাচার ৩৩
-অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ

◈ দিশারী
» চোরা স্রোতে হারিয়ে যেয়ো না ৩৬
-নোমান আব্দুল্লাহ

◈ শিক্ষার্থীদের পাতা
» মনীষী পরিচিতি-৬ : আল্লামা রঈস নাদভী রাহিমাহুল্লাহ ৩৭
-আল-ইতিছাম ডেস্ক

◈ জামি'আহ পাতা
» জীবন এত তিতা কেন? ৩৮
-মো. আরিফুল ইসলাম

◈ হেলথ কর্নার
» ইউরিন ইনফেকশন : প্রকৃতি, কারণ ও প্রতিকার ৩৯
-উম্মে মুহাম্মাদ

◈ কবিতা ৪১

◈ সংবাদ ৪২

◈ সওয়াল-জওয়াব ৪৪

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

মা ও শিশুর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলবেন না

দেশে সন্তান প্রসবে অস্ত্রোপচার বা সিজারিয়ান বাড়ছে উদ্বেগজনকহারে। বছরে প্রায় ৩৬ লাখ শিশুর জন্ম হয়। এর মধ্যে ৪৫ শতাংশ বা ১৬ লাখের বেশি শিশুর জন্ম হয় অস্ত্রোপচারে। এর মধ্যে ৩০ শতাংশ বা ১০ লাখ ৮০ হাজার শিশুর জন্মে অপ্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচার হচ্ছে। ২০০৪ সালে সিজারের মাধ্যমে সন্তান হতো ৪ শতাংশ, ২০০৭ সালে হতো ৯ শতাংশ এবং ২০১১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৭ শতাংশে। আরও পরে ২০১৭ সালে এই সংখ্যা হয় ৩৫.৫ শতাংশ। এছাড়া গ্রামাঞ্চলে ঐ সময় অস্ত্রোপচার করে বাচ্চা হওয়ার হার ছিল ১.৯৭ শতাংশ, যা ২০১৭-১৮ সালে এসে দাঁড়ায় ২৯.১৮ শতাংশে। ২০১৫ সালে প্রকাশিত হেলথ বুলেটিনে বলা হয়, দেশের বিভিন্ন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে জন্মদান প্রায় আট গুণ বেড়েছে। ২০১৩ সালে বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে ১ লাখ ৬৬ হাজার ৭২১ জন গর্ভবতী মা ভর্তি হন। এর মধ্যে ১ লাখ ১৭ হাজার ১৬৪ জন শিশু অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে জন্ম নেয়। কিন্তু এদের মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশের প্রসব স্বাভাবিকভাবেই করা যেত বলে প্রতিবেদনে বলা হয়। জরিপে বলা হয়, দেশে স্বাভাবিক প্রসব ৬২.১ শতাংশ, সিজারিয়ান ৩৫.৫ শতাংশ এবং অন্যান্যভাবে ২.৫ শতাংশ সন্তানের জন্ম হয়। অথচ আমাদের আশেপাশের রাষ্ট্রগুলোতে এই অস্ত্রোপচারের হার অনেক কম; উন্নত দেশগুলোর কথা না হয় না-ই বললাম।

অপ্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচারের ৮৪ শতাংশ হচ্ছে বেসরকারি চিকিৎসাপ্রতিষ্ঠানে। সরকারি হাসপাতালে হচ্ছে ১৪ শতাংশ। বাকি ২ শতাংশ হচ্ছে এনজিও পরিচালিত কিছু স্বাস্থ্যকেন্দ্রে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদণ্ড অনুযায়ী, ১৫ শতাংশের বেশি অস্ত্রোপচার হলে তা অপ্রয়োজনীয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সংস্থাটি বলছে, প্রতি ১০০ গর্ভধারণে ১০ থেকে ১৫ জন মায়ের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। তখন প্রসবে জটিলতার আশঙ্কা দেখা দেয়। এসব ক্ষেত্রে মা ও সন্তানের জীবন রক্ষায় প্রসবের সময় অস্ত্রোপচার করতে হয়। এটি একটি জীবনরক্ষাকারী ব্যবস্থা।

অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন ও সময় বাঁচানোর জন্য একশ্রেণির চিকিৎসক বা চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অপ্রয়োজনে নানা কৌশলে প্রসূতি মায়েদের সিজারিয়ানে বাধ্য করে বলে অভিযোগ রয়েছে। তবে মা ও তার পরিবারের অসচেতনতাও এর জন্য কম দায়ী নয়। কেউ ভয়ে আবার কেউ অনেকটা ফ্যাশানের কারণে এপথ বেছে নেয়। বেশি বয়সে বিয়ে হওয়াও অপ্রয়োজনীয় সিজারের অন্যতম কারণ। একজন গাইনি বিভাগের প্রধান বলেন, প্রথম সন্তান সিজারিয়ানের মাধ্যমে হলে পরের সন্তানও সিজারিয়ান করাতে হবে, এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা।

অপ্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচারের কারণে মানুষের প্রতি দুই ধরনের যুলম করা হচ্ছে: ক. শারীরিক ও খ. আর্থিক। অপ্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচারের খপ্পরে পড়ে অনেক গর্ভবতী মা অকাল মৃত্যুর শিকার হন। আর বেঁচে থাকা অনেক মা ও তার শিশুসন্তান পড়েন মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকিতে, যা সারা জীবন তাদের ভোগ করতে হয়। সিজারিয়ান শিশু অপেক্ষাকৃত কম বুদ্ধিমান হয় এবং তার রোগ প্রতিরোধক্ষমতা দুর্বল হয়। এছাড়া এই ধরনের প্রসবে খরচও অনেক বেশি হয়। সবমিলিয়ে একটি অস্ত্রোপচারে গড়ে ৫৫২ মার্কিন ডলার বা ৪৪ হাজার ১৬০ টাকা ব্যয় হয়। ২০২২ সালে প্রসবকালে অপ্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচারে কমপক্ষে ২ হাজার ৩৬৯ কোটি টাকা খরচ হয়। অথচ সব ধরনের যুলম ইসলামে নিষিদ্ধ এবং তা কিয়ামতের দিন অন্ধকারের কারণ হবে *(বুখারী, হা/২৪৪৭)*। ইসলামে যে কোনো অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ *(আন-নিসা, ৪/২৯; মুসলিম, হা/২৫৬৪)*।

অপ্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচার বন্ধ করতে হবে। নইলে পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে। অতএব, (১) মা ও তার পরিবারে সচেতনতা তৈরি করতে হবে এবং মায়ের গর্ভকালীন স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে। (২) চিকিৎসক এবং হাসপাতাল ও ক্লিনিকের মালিকদের আল্লাহকে ভয় করতে হবে আর ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি ছেড়ে মানবিক হতে হবে; পেট কেটে অর্থ উপার্জনের মতো হীন পথ পরিহার করতে হবে। (৩) সরকারের নজরদারি বাড়াতে হবে। অপ্রয়োজনীয় সিজারের সাথে জড়িত ডাক্তার ও ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। (৪) সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে ধাত্রী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সারা দেশে যথেষ্ট পরিমাণ প্রশিক্ষিত নার্স বা মিডওয়াইফ-এর বন্দোবস্ত করতে হবে। (৫) নিরাপদ মাতৃত্বের প্রতি যত্নশীল হতে হবে, ফলে মায়ের গর্ভধারণ থেকে শুরু করে সন্তান প্রসব এবং প্রসব-পরবর্তী স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে।

মহান আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!

যে আমলে জান্নাত লাভ নিশ্চিত হতে পারে!

-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَأَحْلَلْتُ الْحَلاَلَ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَالَ نَعَمْ.

সরল অনুবাদ : জাবের রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনি বলুন, আমি যদি ছালাত আদায় করি, রামাযানের ছিয়াম পালন করি, হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম মনে করি এবং আমি তাতে কোনো কিছু যোগ না করি, তবে কি আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'।[১]

হাদীছটির মর্যাদাগত অবস্থান : অবস্থানগতভাবে হাদীছটি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী এবং এর উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত। কারণ আমল দুই ধরনের হয়ে থাকে— (ক) আন্তরিক ও (খ) শারীরিক। আমলগুলো যদি শরীআত অনুমোদিত হয় তবে হালাল, আর যদি নিষিদ্ধ হয় তবে হারাম। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম হিসেবে গ্রহণ করে, তবে সে ধর্মের সমস্ত কার্য সম্পাদন করল এবং নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশকারীর মর্যাদায় সমাসীন হলো।[২] ইবনে হাজার আল-হাইতামী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'হাদীছটি ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলি ও শাখাসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে'।[৩] কাযী ঈয়ায রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম মনে করি' অংশটি ঈমান ও সুন্নাতের কার্যাবলিকে অন্তর্ভুক্ত করে।[৪]

বর্ণনাকারীর পরিচয় : জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম ইবনে ছা'লাবা আল-আনছারী আল-খাযরাজী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু ছিলেন শ্রেষ্ঠ ছাহাবীগণের একজন। তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। জাবের রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, 'হে জাবের! কী হয়েছে? মন খারাপ কেন?' আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম! পরিবারের সদস্য এবং ঋণ রেখে আমার পিতা বদরের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। তিনি জাবের রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-কে বললেন, 'হে বৎস! আমি কি তোমাকে তোমার পিতার শুভ সংবাদ দিব না? মহান আল্লাহ তাঁকে জীবিত করে সরাসরি কথা বলেছেন, যা অন্য কারও ক্ষেত্রে করেননি। তিনি বললেন, হে আমার বান্দা! তুমি আমার নিকট তোমার প্রত্যাশার কথা ব্যক্ত করো। তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে পুনরায় জীবিত করুন, আমি আবার শহীদ হতে চাই। আল্লাহ বললেন, আমার ফয়সালা চূড়ান্ত হয়ে গেছে, তারা এই পৃথিবীতে আর ফিরে আসবে না'।[৫]

তার পিতার ঋণ ছিল, তাই আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার পিতার ঋণের ব্যাপারে এক রাতে আল্লাহর কাছে ২৭ বার ক্ষমা প্রার্থনা করেন। শেষ জীবনে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।[৬] ৭৩ বছর বয়সে তিনি মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন।[৭]

আলোচ্য হাদীছে প্রশ্নকারী ছাহাবীর পরিচয় : তিনি আল-নু'মান ইবনু ক্বাউক্বাল ইবনু আছরাম রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। আল্লামা বাগাবী রাহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন, নু'মান বলেছিলেন, হে রব! আমি আপনার নিকট শপথ করেছি যে, জান্নাতের সবুজ ভূমিতে পা না রাখা পর্যন্ত সূর্য যেন অস্ত না যায়। আর আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, 'আমি তাকে জান্নাতের সবুজ ভূমিতে বিচরণ করতে দেখেছি'।[৮]

হাদীছটির শিক্ষণীয় দিকসমূহ :

(১) ছাহাবীগণ হেদায়াত সম্পর্কে জানার এবং হেদায়াতের সাথে থাকার জন্য আগ্রহী ছিলেন। কোন্ বস্তু মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে, তা জানার জন্য তারা আগ্রহী ছিলেন।[৯]

(২) পার্থিব জীবনে মানুষের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো পরাক্রমশালী আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং তাঁর জান্নাত লাভের জন্য ভালো কাজ করা।[১০]

---

* প্রভাষক (আরবী), বরিশাল সরকারি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বরিশাল।

১. ছহীহ মুসলিম, হা/১৫।

২. মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-জুরদানী, আল-জাওয়াহিরুল লু'লু'ইয়াহ শারহুল আরবাঈন আন-নাবাবিয়্যাহ, পৃ. ২১৩।

৩. আল-ফাতহুল মুবীন, পৃ. ১৬২।

৪. ইবনু খিলফাহ আল-উব্বী, ইকমালু ইকমালিল মু'লিম ফী শারহি ছহীহি মুসলিম, ১/১৪২।

৫. ইবনে কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪/১৮৫।

৬. ইবনু আব্দিল বার্র, আল-ইস্তিআব ফী মা'রেফাতিছ ছাহাবা, ১/২২০।

৭. প্রাগুক্ত।

৮. ইবনু হাজার আসক্বালানী, আল-ইছাবা ফী তাময়ীযিছ ছাহাবা, ৩/৫৬৪।

৯. আল-উছায়মীন, শারহুল আরবাঈন আন-নাবাবিয়্যা, পৃ. ২১৫।

১০. আরবাঊন আন-নাবাবিয়্যা, পৃ. ৭৫।

(৩) জান্নাতে প্রবেশের একমাত্র মাধ্যম হলো আমল। ঈমানের পর অন্য সকল আমলের উপর ছালাতের স্থান। তবে ছালাতের হাদীছে উল্লিখিত অন্যান্য বিষয়ও জান্নাতে প্রবেশের ক্ষেত্রে সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করে।[১১]

(৪) রামাযানের ছিয়ামের গুরুত্ব অনেক বেশি। প্রশ্নকারীর জিজ্ঞাসা করার সময় সম্ভবত অন্যান্য বিষয়ের বিধান অবতীর্ণ হয়নি। তাই সেসব সম্পর্কে কোনো কিছু বলা হয়নি।[১২]

(৫) ইসলাম যেসব বিষয় পালনের আদেশ দিয়েছে, তা পালন করা এবং যেসব বিষয় থেকে বিরত থাকতে বলেছে, তা বর্জন করা জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল [ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম] যেসব বিষয় হালাল করেছেন, সেগুলোকে হালাল হিসেবে গ্রহণ করা এবং যেসব বিষয় হারাম করেছেন, তা হারাম হিসেবে গ্রহণ করা একজন প্রকৃত মুমিনের কাজ।[১৩]

হাদীছটির ব্যাখ্যা : আল্লামা নববী [রহিমাহুল্লাহ] ইবনু ছালাহ [রহিমাহুল্লাহ] থেকে বর্ণনা করে বলেন, এর (হারামকে হারাম মনে করা) অর্থ এই বিশ্বাস করা যে, এটি হারাম এবং তা থেকে বিরত থাকা। তিনি এর মাধ্যমে দু'টি বিষয়কে বুঝাতে চেয়েছেন। একটি হারাম মনে করা এবং অপরটি তা না করা। তবে হালালকে হালাল মনে করার অর্থ এমন নয়। কেননা এখানে কোনো বস্তুকে হালাল মনে করাই যথেষ্ট। তার সাথে বিশ্বাসকে সংযুক্ত করার প্রয়োজন নেই।[১৪] (আর এর উপর কোনো বিষয় বৃদ্ধি না করা) বলতে বোঝানো হয়েছে, তিনি খুব নিকটবর্তী সময়ে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছেন, তাই তিনি এতটুকুকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। যাতে তিনি সন্তুষ্ট থাকতে পারেন, সৎ আমল ও কল্যাণের প্রতি তার আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং ফরয আমল আদায় তার জন্য সহজতর হয়। কিংবা হতে পারে তিনি জিহাদ বা অন্যান্য সৎকর্মে ব্যস্ত আছেন। নফল ইবাদতে আত্মনিয়োগ করা এখনই তার জন্য সহজ নয়।[১৫]

(আমি কি জান্নাতে প্রবেশ করব?) অর্থাৎ পূর্ববর্তী শাস্তি ছাড়াই। (তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ) কারণ ইসলাম গ্রহণ না করায় তাঁর যা করার প্রয়োজন ছিল তা তিনি করতে পারেননি।

১১. প্রাগুক্ত।

১২. আল-আব্বাদ, ফাতহুল ক্বয়ী আল-মাতীন, পৃ. ৭৭।

১৩. প্রাগুক্ত।

১৪. ইমাম নববী, শারহু মুসলিম, ১/১৭৫।

১৫. ইমাম নববী, শারহু মুসলিম, ১/১৬৭; মূসা শাহীন লাশীন, ফাতহুল মুনঈম শারহু ছহীহ মুসলিম, ১/৫২।

আল্লাহ যখন তাঁর রাসূল [ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম]-কে প্রেরণ করেন, তখন তাঁকে মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল করে প্রেরণ করেছেন। প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য সবচেয়ে সরল পথের পরিদর্শক হিসেবে প্রেরণ করেন, যা নিম্নের আয়াতে লক্ষণীয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ 'আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত করে পাঠিয়েছি' *(আল-আম্বিয়া, ২১/১০৭)*। এই অর্থকে নিশ্চিত করে এমন অনেক চিত্র আমাদের মনে উদীয়মান, কেননা নবী [ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম] তাদেরকে হেদায়াত প্রদান এবং পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করার জন্য সকল প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন।

এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য মানুষের ক্ষমতা ও শক্তির বৈচিত্র্য সম্পর্কে পূর্ণ সচেতনতা প্রয়োজন। কারণ আল্লাহর অমোঘ সৃষ্টিকৌশলের বড় নিদর্শন হলো, সকল মানুষ একই স্তরের নয়, বরং তাদের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। তাইতো আছ-ছিদ্দীক্ব এবং আল-ফারূক, যারা জাতির নেতৃত্ব প্রদান ও মর্যাদার বিচারে পাহাড়ের চূড়া এবং মেঘের উচ্চতা অতিক্রম করেছিলেন, তাদের মতো মহান ব্যক্তিত্বরা যেমন ছাহাবীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তেমনি তাদের বিপরীতে মরুভূমির বেদুঈন, দুর্বল মহিলা, বয়স্ক পুরুষ এবং অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তিও ছাহাবীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা দৃঢ়তায় সর্বনিম্ন এবং কম উচ্চাভিলাষী।

এই হাদীছে একজন ছাহাবী অনুসন্ধিৎসু মনে আল্লাহর রাসূল [ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম]-কে জিজ্ঞেস করেছেন। তিনি প্রশ্ন করেছেন কোন্ আমল তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। তিনি জান্নাতে যাওয়ার সবচেয়ে সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথ সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। এটি জান্নাতের সুখের প্রতি যত্ন ও আগ্রহের পরিপূর্ণতার নিদর্শন, পরকালীন জীবনের প্রতি আসক্তির লক্ষণ, শুভ পরিণাম এবং চূড়ান্ত ফলাফল লাভের পরম আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ। মুমিনের হৃদয়ে এর উপস্থিতি তার ঈমান ও আন্তরিকতার প্রমাণ, আল্লাহর প্রতি তার আসক্তি এবং নশ্বর জগতের উপর অবিনশ্বর জগতকে প্রাধান্য প্রদানের দলীল।[১৬] দুনিয়াবিমুখ, জান্নাত লাভে আসক্ত, পরপারের যাত্রী সালাফ তথা পূর্বসূরিদের অবস্থা এমনই ছিল। এ ক্ষেত্রে সবার অগ্রবর্তী ছিলেন আমাদের নবী [ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম]। তিনি বলেন, 'আমার ও দুনিয়ার কী হয়েছে? আমার ও দুনিয়ার দৃষ্টান্ত একজন পথিকের ন্যায়, যিনি একটি গাছের নিচে বিশ্রাম গ্রহণ করেন, অতঃপর তা ছেড়ে চলে যান'।[১৭]

১৬. ফাতহুল মুনঈম শারহু ছহীহ মুসলিম, ১/৫০।

১৭. তিরমিযী, হা/২৩৭৭; ইবনু মাজাহ, হা/৪১০৯; আহমাদ, হা/৩৭০৯।

এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর অবস্থা ছিল খুবই বিস্ময়কর। উক্বা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বিকেলে মদীনায় নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর পিছনে ছালাত পড়লাম, অতঃপর তিনি দ্রুত উঠে লোকদের ঘাড় অতিক্রম করে তাঁর কোনো স্ত্রীর নিকটে গেলেন। অতঃপর লোকেরা তার গতি দেখে ভয় পেয়ে গেল। অতঃপর তিনি তাদের নিকট বের হয়ে আসলেন। তিনি বললেন, 'আমাদের নিকট যাকাতের যে স্বর্ণ ছিল তা আমার স্মরণে এসে যায়। আমি ভয় পেয়ে যাই হয়তো আল্লাহর নিকট এর জবাবদিহি করতে হবে'। অতঃপর তিনি তা মানুষের মধ্যে বণ্টন করে দিতে বললেন।[১৮]

আর যে কেউ আমাদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করে সে দেখতে পায়, আমাদের মধ্যে অনেকেই তার হৃদয়কে দুনিয়ার সাথে সংযুক্ত করে, এর সাজসজ্জায় মুগ্ধ হয়, এর ধ্বংসাবশেষ সংগ্রহ করে তার হৃদয় পরকালকে ভুলে যায়, এর জন্য কাজ করার চেষ্টা করে না এবং এর প্রতিদান অর্জনের চেষ্টা করে না।

তিনি বলেন, আমি ফরয ছালাত আদায় করি, রামাযানের ছিয়াম রাখি, হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম মনে করি এবং এর চেয়ে বেশি আর কোনো আমল করতে চাই না, তবে কি আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব?

এ প্রশ্ন বেশ কয়েকজন ছাহাবী (রাযিয়াল্লা-হু আনহুম) থেকে বিভিন্নরূপে এবং বিভিন্ন ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। ত্বলহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, নাজদের অধিবাসী এলোমেলো চুলবিশিষ্ট একজন লোক নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আসলেন। তাঁর গুনগুন শব্দ শুনা যাচ্ছিল, তবে তিনি কী বলছিলেন বুঝা যায়নি। তিনি ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করবে'। তিনি বললেন, এ ছাড়া আর কোনো ছালাত? তিনি বললেন, 'না, তবে নফল ছালাত পড়তে পারবে'। আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'তোমাকে রামাযানের এক মাস ছিয়াম রাখতে হবে'। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ ছাড়া আর কোনো ছিয়াম? তিনি বললেন, 'না, তবে নফল ছিয়াম আদায় করতে পার'। তিনি তাঁকে যাকাত আদায়ের কথা বললেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ ছাড়া আর কোনো যাকাত? তিনি বললেন, 'না, তবে নফল ছাদাক্বা করতে পার'। বর্ণনাকারী বলছেন, তিনি চলে যাওয়ার সময় বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি এতে কোনো বেশি ও কম করব না। আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'তিনি সত্য বলে থাকলে তিনি পরিত্রাণ পেয়ে গেছেন'।[১৯]

আবূ আইয়ূব আনছারী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে বললেন, আমাকে এমন কিছু আমলের কথা বলুন, যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সাথে কোনো কিছু শরীক করো না, ছালাত ক্বায়েম করো, যাকাত দাও এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখো'।[২০]

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যে প্রশ্নকারী রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে এই হাদীছে জিজ্ঞেস করেছিলেন, যার আলোচনায় এখন আমরা আছি, তিনি নিজের জন্য যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, তা বেছে নেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন। কারণ তিনি ফরয ছালাতের কথা উল্লেখ করেছেন, যা আল্লাহকে এক হিসেবে বিশ্বাস এবং রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর রিসালাতে বিশ্বাসের পরে ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ বিধান। এমনকি এর বর্জনকারী সম্পূর্ণরূপে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায়। ছহীহ হাদীছে বলা হয়েছে, 'আমাদের এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য যে অঙ্গীকার করা হয়েছে, তা হলো ছালাত, যে ছালাত বর্জন করব সে কাফের'।[২১]

ছালাতের পর তিনি রামাযানের ছিয়ামের কথা উল্লেখ করেছেন, যা ইসলামের অন্যতম বড় স্তম্ভ, যার উপর মুসলিমরা একমত পোষণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা এর জন্য মহান ছওয়াবের ব্যবস্থা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম রাখবে, তার অতীতের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে'।[২২]

অতঃপর তিনি ইসলামী শরীআত ও বিধানের সীমায় দাঁড়িয়ে আল্লাহ তাআলার কিতাবে যা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাতে যা বর্ণিত হয়েছে তা অনুসরণ এবং উক্ত উৎসদ্বয়ে যা নিষেধ করা হয়েছে তা পরিহারের পূর্ণ অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। ফযীলত ও পছন্দনীয় আমলের কোনোরূপ সংযোজন-বিয়োজন না করে।

এই হাদীছে যাকাত ও হজ্জের কথা উল্লেখ করা হয়নি। যদিও উভয় ইবাদতের গুরুত্ব অন্যান্য ইবাদতের চেয়ে কম নয়। কারণ হজ্জ, যাকাত এবং অন্যান্য ইবাদতের মধ্যে পার্থক্য আছে। মুকাল্লাফ তথা যাদের উপর শারঈ বিধান আরোপ করা হয়েছে, হজ্জ ও যাকাতের আবশ্যকতা তাদের

---

১৮. ছহীহ বুখারী, হা/৮৫১।
১৯. ছহীহ বুখারী, হা/১৮৯১।
২০. ছহীহ বুখারী, হা/১৩৯৬।
২১. ছহীহ মুসলিম, হা/৮২।
২২. ছহীহ বুখারী, হা/৩৮।

সকলকে শামিল করে না। কেননা হজ্জ কেবল সক্ষম ব্যক্তির উপর আবশ্যক। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ ‘আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে মানুষের মধ্যে তাদের উপর হজ্জ করা ফরয, যারা সেখানে পৌঁছাতে সক্ষম’ *(আলে ইমরান, ৩/৯৭)*। তাছাড়া যারা নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নয়, তাদের উপর যাকাত ফরয নয়। আবার হতে পারে যাকাত বা হজ্জ ফরয হওয়ার পূর্বে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। কারণ হজ্জ অষ্টম হিজরীতে ফরয হয়েছিল আর যাকাত যদিও মক্কায় ফরয হয়েছিল কিন্তু নিছাবের পরিমাণ তখন পর্যন্ত নির্দিষ্ট ছিল না। নিছাবের বিধান মদীনায় কার্যকর হয়েছিল। অথবা যাকাত ও হজ্জ হালালকে হালাল মনে করা এবং হারামকে হারাম মনে করার বিধানের অন্তর্ভুক্ত।[২৩]

এখানে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে সুসংবাদ হলো, জান্নাতে প্রবেশের জন্য উক্ত সুস্পষ্ট পন্থা মেনে চলাই যথেষ্ট। এতে ইসলামের সহজতা ও সহনশীলতা প্রতিফলিত হয় আর কষ্ট ও কাঠিন্য থেকে মুক্তির পথ প্রতীয়মান হয়। ঈমান বৃদ্ধির আমল সহজতর হয়, ইবাদতে আত্মনিয়োগ ও শারঈ বিধান পালন আনন্দদায়ক হয়। মানুষের শক্তি ও সামর্থ্যের সীমানার মধ্যে থাকা স্বাভাবিক হয়। এটি এই উম্মতের বিশেষ বিশেষত্ব, যা তাকে মর্যাদায় অন্যান্য জাতি থেকে পৃথক করেছে।[২৪]

কিন্তু এমন একটি বিষয় আছে, যা উল্লেখ না করে পারা যায় না। তা হলো বান্দার আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী আনুগত্যের অঙ্গীকার করা এবং হারাম বিষয়গুলো পরিহার ও পরিত্যাগ করার জন্য আন্তরিক সংকল্প করা। আত্মার পবিত্রতার জন্য সত্যিকারের সংগ্রাম করতে হবে।

জান্নাত অত্যন্ত মূল্যবান বিষয় আর এর মূল্য পাওয়া যায় সৎকর্মের মাধ্যমে। যেমন আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ‘এই হলো জান্নাত তোমাদেরকে যার উত্তরাধিকারী করা হয়েছে, কারণ তোমরা (সৎ) আমল করেছিলে’ *(আয-যখরুফ, ৪৩/৭২)*।

আর যদি বান্দার উদ্দেশ্য সত্য হয়, তবে সে আবশ্যকভাবে জান্নাতের উত্তরাধিকারী হবে।

যা-ই হোক না কেন, যারা আল্লাহর পথের প্রচারক, তাদের অবশ্যই এই ধর্মের প্রকৃতি বুঝতে হবে, যাতে তারা মানুষকে এর মূলনীতি অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দিতে পারে। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করেন এবং বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর প্রশংসা করার তাওফীক্ব দেন।

হারামকে হারাম মনে করার অর্থ হলো, এ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা এবং হালালকে হালাল মনে করার অর্থ এই বিশ্বাস পোষণ করা, যে কাজটি করা জায়েয।

ইমাম কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ তার আল-মুফহিম গ্রন্থে বলেন, এই হাদীছে প্রশ্নকারীর নিকট রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নফল ইবাদত সম্পর্কে কোনো কথা উল্লেখ না করা এ কথার ইঙ্গিত বহন করে যে, নফল ইবাদত আদায়ে শরীআত কোনো বাধ্যবাধকতা আরোপ করেনি; তবে সে নিজেকে একটি মহান মুনাফা ও বিশাল পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করেছে। তবে যে ব্যক্তি অব্যাহতভাবে সুন্নাহর আমল বাদ দিতে থাকবে, সে দ্বীনী বিষয়ে অভাববোধ করবে এবং তার ন্যায়ভিত্তিক আচরণ প্রশ্নবিদ্ধ হবে। আর যদি সে অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্বক কিংবা অনাগ্রহবশত বর্জন করে, তবে তা পাপাচার হিসেবে গণ্য হবে এবং এর জন্য সে নিন্দিত হবে। জ্ঞানীগণ বলেন, যদি কোনো জনপদবাসী কোনো সুন্নাত ত্যাগ করার ব্যাপারে একমত পোষণ করে, তবে তারা ফিরে না আসা পর্যন্ত তাদেরকে হত্যা করা হতো। প্রথম শ্রেণি থেকে সাধারণ শ্রেণি পর্যন্ত সকল ছাহাবী সুন্নাহ ও ফযীলতের আমল পালনে অবিচল থাকতেন, ফরয ইবাদত আদায়ে অটল থাকতেন এবং এর ছওয়াব লাভে ধন্য হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না।[২৫]

সংক্ষিপ্ত অথচ স্থায়ী আমল কম করেও জান্নাতে যাওয়া যায়। তবে নিখাদ আন্তরিকতা, গভীর ভালোবাসা এবং চূড়ান্ত শ্রদ্ধা দিয়ে আমলে ছালেহ করার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু আমরা অনেক সময় পরম আন্তরিকতার সাথে ফরয ইবাদতসমূহ সম্পাদন করতে পারি না; ফলে তাতে ঘাটতি পড়ে যায়। যেহেতু নফল ইবাদতের মাধ্যমে ফরযের ঘাটতি পূরণ করা হবে, সেহেতু নফল ইবাদতের প্রতি অনাগ্রহ প্রদর্শন নিঃসন্দেহে চরম নির্বুদ্ধিতার কাজ। তাই নফল ইবাদতের প্রতি অনাগ্রহ নয়; বরং ফরয ইবাদতের পাশাপাশি নিখাদ আন্তরিকতা ও পরম শ্রদ্ধার সাথে নফল ইবাদত সম্পাদন করাও উচিত। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দিন- আমীন!

---

২৩. ফাতহুল মুনঈম শারহু ছহীহ মুসলিম, ১/৫২।

২৪. প্রাগুক্ত, ১/৫১।

২৫. কুরতুবী, আল-মুফহিম শারহু মুসলিম, ১/১৬৬।

আল্লাহর দিকে দাওয়াত : দলীয় মোড়কে নাকি পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে?

মূল : আলী ইবনে হাসান আল-হালাবী আল-আছারী
*অনুবাদ : আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী**

(পর্ব-১৩)

একাদশ পরিচ্ছেদ: হিযবিয়্যাহ বা দলাদলি হারাম

সমস্ত মুসলিমের নিকট একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয় হচ্ছে, ‘ইসলাম মুসলিমদেরকে এমন বন্ধনে বেঁধেছে, মানবরচিত কোনো সংগঠনের পক্ষে যার ধারেকাছে যাওয়া মোটেও সম্ভব নয়— সেই সংগঠন যতই শক্তি ও সূক্ষ্মতা অর্জন করুক না কেন। ইসলামে ইসলামী ভ্রাতৃত্বই হচ্ছে অলা ও বারা তথা সম্পর্ক রক্ষা বা ছিন্ন করার মূল ভিত্তি। অতএব, একজন মুসলিম অপর মুসলিমের বন্ধু, সে তাকে চিনুক বা না চিনুক; বরং একজন যদি প্রাচ্যে এবং অপরজন পাশ্চাত্যে থাকে, তবুও।[1]

একথার অর্থ এই যে, ইসলাম তার অভ্যন্তরে ভিন্ন কোনো সংগঠন বা বিশেষ ব্যবস্থাপনার অনুমোদন দেয় না, যে সংগঠন বা ব্যবস্থাপনার মূলনীতি সম্পর্ক রক্ষা করা বা ছিন্ন করার মূলনীতি হিসেবে গণ্য হতে পারে। কারণ এই ধরনের সংগঠন বা বিশেষ ব্যবস্থাপনার দাবি হচ্ছে, যে ব্যক্তি সেখানে যুক্ত থাকবে, সে সাহায্য-সহযোগিতা, ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি অধিকার পাওয়ার হক্বদার। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি সেখানে যুক্ত থাকবে না, সে এই অধিকারগুলো পাওয়ার হক্বদার নয়। অথচ ইসলাম একজন মুসলিমকে এই অধিকারগুলোর সবই দিয়েছে কেবল মুসলিম হওয়ার কারণে; **অন্য কোনো কারণে নয়।** এখান থেকেই নিম্নবর্ণিত হাদীছটির মর্মার্থ স্পষ্ট হয়: لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً ‘ইসলামে কোনো মৈত্রীচুক্তি নেই। তবে জাহেলী যুগে ভালো কাজের জন্য যেসব চুক্তি করা হয়েছে, তাকে ইসলাম আরও দৃঢ় ও মযবূত করেছে’।[2]

অতএব, ইসলাম যেহেতু সমস্ত ভালোবাসা-বন্ধুত্বের মর্মমূলে কুঠারাঘাত করেছে, জাহেলীযুগে যেগুলো ছিলো সম্পর্ক রক্ষা বা ছিন্ন করার মূলভিত্তি এবং ইসলামকেই সম্পর্ক রক্ষা বা ছিন্ন করার মূল উপাদান হিসেবে গণ্য করেছে আর সকল মুসলিমকে অধিকারের ক্ষেত্রে সমান গণ্য করেছে, সেহেতু ইসলামে বিচ্ছিন্ন, ভিন্ন ভিন্ন দল-উপদল তৈরির অন্য কোনো সুযোগ অবশিষ্ট নেই। **যদি কোনো এক দলের বিশেষ কোনো অধিকার ও সম্পর্ক থাকত, তখন না হয় পৃথক সম্প্রীতির চুক্তি করার প্রয়োজন পড়ত।**

ফলে, হাদীছটি প্রমাণ করে, দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে যাওয়া ইসলামের সাথে মানায় না এবং ইসলামে তা কল্পনাই করা যায় না’।[3] ‘কারণ বিশেষ চুক্তির মাধ্যমে পার্থক্য সৃষ্টিই চুক্তির বাইরের মানুষকে চুক্তিবদ্ধ মানুষের তুলনায় নিম্নস্তরের করে দেয়’।[4] আর এটা শরী‘আতে জায়েয নেই। কেননা নিম্নমান বা উঁচুমানের মূলভিত্তিই হচ্ছে সৎকাজ; সম্প্রীতি ও জামা‘আতবদ্ধতার উল্টো কোনো কিছু নিম্নমান বা উঁচুমান নির্ণয়ের মানদণ্ড হতে পারে না। শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘কারো অধিকার নেই যে, সে উম্মতের জন্য নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কাউকে খাঁড়া করে তার পথে মানুষকে আহ্বান করবে এবং সেই পথকে কোনো মুসলিমের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক গড়া বা না গড়ার মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করবে। অনুরূপভাবে তার জন্য এটাও বৈধ নয় যে, সে আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বক্তব্য এবং যেসব বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর ‘ইজমা’ হয়েছে, সেগুলো ব্যতীত অন্য কোনো বক্তব্যের জন্ম দিয়ে তাকে কোনো মুসলিমের সাথে আন্তরিক সুসম্পর্ক গড়া বা না গড়ার মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করবে। **বরং এটি বিদ‘আতীদের কাজ,** যারা উম্মতের জন্য কোনো ব্যক্তি বা বক্তব্যকে দাঁড় করিয়ে এর মাধ্যমে তাদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করে; ফলে তারা এই সৃষ্ট বক্তব্য বা এই সম্বন্ধের উপর ভিত্তি করে মিত্রতা বা শত্রুতা পোষণ করে’।[5]

---

* বি. এ. (অনার্স), উচ্চতর ডিপ্লোমা, এম. এ. এবং এম.ফিল., মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; অধ্যক্ষ, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. লালকাঈ তার ‘শারহু উছূলিস সুন্নাহ’ (নম্বর ৫০) গ্রন্থে ইউসুফ ইবনে আসবাত-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি সুফিয়ান ছাওরীকে বলতে শুনেছি, إِذَا بَلَغَكَ عَنْ رَجُلٍ بِالْمَشْرِقِ صَاحِبِ سُنَّةٍ وَآخَرَ بِالْمَغْرِبِ فَابْعَثْ إِلَيْهِمَا بِالسَّلَامِ وَادْعُ لَهُمَا مَا أَقَلَّ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. ‘পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে এবং পশ্চিম প্রান্তে অবস্থানকারী আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের দু’জন ব্যক্তির সংবাদ যদি তোমার কাছে পৌঁছে, তাহলে তাদের উভয়ের নিকট তুমি সালাম পাঠাও এবং তাদের জন্য দু‘আ কর। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের লোকদের সংখ্যা কতই না কম!’।

এটাই হচ্ছে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের পারস্পরিক সম্পর্কের আল্লাহপ্রদত্ত ব্যবস্থাপনা।

অতএব, দলবাজ এবং বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী বিদ‘আতী সংগঠনসমূহের দাঈগণ যেন আল্লাহকে ভয় করেন, যারা তাদের দল ও সংগঠনের নির্দেশনা মোতাবেক সম্পর্ক রক্ষা করেন বা ছিন্ন করেন।

২. ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৩০।

৩. আল-আহযাব আস-সিয়াসিয়্যাহ, ১/১২৩; তাম্বীহু উলিল আবছার, পৃ. ২৫২।

৪. মুছান্নাফাতুন নুযুমিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৩৩১; এখান থেকেই বক্তব্যটি ‘হুকমুল ইনতিমা’ কিতাবের ১২৩ পৃষ্ঠায় সংকলিত হয়েছে।

৫. মাজমূ‘উল ফাতাওয়া, ২০/১৬৪; আল-ফাতাওয়া আল-‘ইরাক্বিয়্যাহ, পৃ. ১০০-১০১।

'বর্তমান সময়ের অনেক ইসলামী জামা'আত ও দলের কিন্তু একই অবস্থা। তারা কিছু ব্যক্তিকে তাদের নেতৃত্বের আসনে বসিয়ে তাদের বন্ধুদের সাথে বন্ধুত্ব পোষণ করছে এবং শত্রুদের সাথে শত্রুতা পোষণ করছে আর তারা (নেতারা) তাদের জন্য যা ফতওয়া দিচ্ছে, তাতেই তারা তাদেরকে অনুসরণ করছে। এক্ষেত্রে তারা কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে যাচ্ছে না বা তাদের বক্তব্য ও ফতওয়ার পক্ষের দলীল সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করছে না।

এই ধরনের কোনো মানহাজ পরিবর্তনের বা মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের ভিত্তি হতে পারে না। বরং কতিপয় দেশ বা দলের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও কোনো একটি মাযহাবের উপর বা দলের উপর মুসলিমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে— এমনটা কখনও ঘটেনি'।[৬]

'এই অর্থের উপর ভিত্তি করে ইসলামে বিভিন্ন নীতিগত দলের হুকুম উপলব্ধি করা সম্ভব। কারণ নৈতিক দলগুলো নিজেদের জন্য চয়নকৃত মূলনীতি ও সূত্রাবলির উপর দলের লোকদেরকে সংগঠিত করে। অতঃপর দলে যোগদানকে সম্পর্ক রক্ষা করা বা ছিন্ন করার মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করে। কোনো দল যখন সেই দলের বাইরের কারো সাথে সদ্ব্যবহার করে, তখন তার সাথে ঠিক সেভাবে ব্যবহার করে, যেভাবে মহান আল্লাহ মুসলিমদেরকে কাফেরদের সাথে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন। ঠিক এভাবে— ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ 'দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ি-ঘর থেকে বের করে দেয়নি, তাদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করতে এবং তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না' *(আল-মুমতাহানা, ৬০/৮)*।

এই সদ্ব্যবহারের উপরে যে আন্তরিক সম্পর্ক হতে পারে, সেই আন্তরিক সম্পর্ক দল কেবল তাকেই দেয়, যে তাতে যোগদান করে।

এরপর বলতে চাই, আমরা যদি ইসলামে বহু নৈতিক দল তৈরির পক্ষে মত দেই, তাহলে এখানে দু'টি বিষয়: হয় দল কারো সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা বা ছিন্ন করার মূলভিত্তি হিসেবে ইসলামকে গ্রহণ করবে অন্যথা অন্যকিছুকে। দল যদি ইসলামকেই কারো সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা বা ছিন্ন করার মূলভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে, **তাহলে ইসলামে এ ধরনের দল বা সংগঠন খোলার দরকারই নেই**। কারণ ইসলাম নিজেই সেই ভিত্তি হওয়ার জন্য যথেষ্ট'।[৭]

'মূল কথা হচ্ছে, শরী'আত সেসব বিষয়কে পুরোপুরি হারাম করে, যেগুলো একজন মুসলিমের সাথে অপর মুসলিমের সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়। অপরপক্ষে, সেসব বিষয়কে অবধারিত করে, যেগুলো একজন মুসলিমের সাথে অপর মুসলিমের সম্পর্ক ও ভালোবাসার বন্ধন সৃষ্টি করে'।[৮]

এর আলোকে, হুকুম স্পষ্ট হয়ে গেলো এবং প্রমাণিত হলো যে, এসব দলাদলি নিষিদ্ধ।[৯] এই নিষেধাজ্ঞা যুক্তি ও দলীলের আলোকে অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ সবভাবেই প্রমাণিত, যে হুকুমকে রদ করার সাধ্য কারো নেই ইনশাআল্লাহ; তবে কিছু ফাঁকা বুলি আওড়ানো সম্ভব... অস্বীকার করা সম্ভব... ভয়ভীতি দেখিয়ে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেওয়া সম্ভব... অবশ্য এগুলোর কানাকড়িও কোনো মূল্য নেই।

সঊদী আরবের উচ্চ উলামা পরিষদের স্থায়ী কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত ফতওয়া[১০] এই নিষেধাজ্ঞাকেই শক্তিশালী করে এবং এসব দলাদলি হারাম হওয়ার ব্যাপারটা পরিগ্রহ করে।[১১] ফতওয়াটি শায়খ আব্দুল আযীয ইবনে বায-এর সভাপতিত্বে ৭/১০/১৩৯৭ হিজরীতে প্রকাশিত হয়, যার নম্বর ১৬৭৪।

ইসলামী ফিক্বহ একাডেমির চেয়ারম্যান শায়খ বাকর আবু যায়েদ বিরচিত 'হুকমুল ইনতিমা ইলাল জামা'আত ওয়াল আহযাব আল-ইসলামিয়্যাহ' বইটিতে সুস্পষ্ট অনেক দলীল-প্রমাণের আলোকে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে। যা কোনো ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে খণ্ডন করা সম্ভব নয় এবং কোনো বাতিলপন্থীও সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : হিযবিয়্যাহ বা দলাদলির চিত্র

এ বিষয়ে কোনো আলেমের মধ্যে দ্বিমত নেই যে, 'নাম বদলালে বাস্তবতা বদলায় না'।[১২] সুতরাং আমরা মন্দের নাম যদি ভালো দিয়ে দেই, তাহলে তা ভালো হবে না। অনুরূপভাবে অনিষ্টের নাম যদি কল্যাণ দিয়ে দেই, তাহলে তা কল্যাণ হবে না। এভাবে...

৬. মুহাম্মাদ সুরূর যায়নুল আবেদীন, মানহাজুল আম্বিয়া ফিদ-দাওয়াতি ইলাল্লাহ, ১/১৬।
৭. আল-আহযাব আস-সিয়াসিয়্যাহ, পৃ. ৪৬।
৮. আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক, আল-মাক্বাছেদ আল-'আম্মাহ লিশ-শারী'আতিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৩২।
৯. দেখুন: মুহাম্মাদ ইবরাহীম শাক্করাহ, 'নাযরাহ মাওযূ'ইয়্যাহ ফিত-তা'আদ্দুদিয়্যাহ ওয়াল হিযবিয়্যাহ, (৫/২/১৯৯০ সালে সোমবারে 'জারীদাতুদ-দুসতূর আল-উরদুনিয়্যাহ-তে প্রকাশিত প্রবন্ধ)। এখানে এই নিষেধাজ্ঞার সমর্থনে বক্তব্য রয়েছে।
১০. সেই ফতওয়া থেকেই শায়খ ছলেহ আস-সুহাইমী রচিত 'মানহাজুস সালাফ ফিল আক্বীদাহ ওয়া আছারুহু ফী ওয়াহদাতিল মুসলিমীন' বইয়ের ৪০ পৃষ্ঠায় আলোচনা উদ্ধৃত হয়েছে।
১১. আমাদের শিক্ষাগুরু বর্তমানযুগের মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানীর বক্তব্যে অনেক কিছুই রয়েছে, যেগুলো দলাদলি হারাম হওয়ার ব্যাপারটা জোরদার করে এবং এসবের বিচ্যুতি ও ভয়াবহতা বর্ণনা করে। তার বক্তব্যগুলো সংকলন করলে পৃথক পুস্তকে পরিণত হবে, যার কিছু কিছু ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। তার বক্তব্যগুলো তার বিভিন্ন ক্যাসেটে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে, যেগুলো তার বিভিন্ন তা'লীমী বৈঠক ও ফতওয়া থেকে সংকলিত হয়েছে।
১২. ইবনুল ক্বাইয়িম, 'মিফতাহু দারিস সা'আদাহ, পৃ. ১৫৩ ও 'ই'লামুল মুওয়াক্কে'ঈন, ৩/১৩০।

সুতরাং বিভক্তির নাম যদি ঐক্য দিয়ে দেই, তাহলে তা শরী'আতসম্মত হবে না। দুর্বলতার নাম শক্তি দিয়ে দিলে তা শক্তি হবে না। আর **হিযবিয়্যাহ বা দলাদলি দ্বীন হয়ে যাবে না, যদি তার নাম দিয়ে দেই 'যৌথ কাজ' বা 'জামা'আত' বা 'সংগঠন' বা 'কমিটি' বা 'আন্দোলন' বা অন্য কিছু।**

মূল বিষয় হচ্ছে বাস্তবতায়; নামে নয়। সেকারণে 'শরী'আতে নিষিদ্ধ কোনো বিষয়ের হুকুম তার গঠন পরিবর্তন হওয়ার কারণে পরিবর্তন হয়ে যাবে না'।[১৩]

এই নামগুলো ছোট হতে পারে, কিন্তু এর ভয়াবহতা বিরাট। এজন্য, 'দ্বীনের ব্যাপারে ছোট ছোট নবাবিষ্কার থেকে বেঁচে থাকুন। কারণ ছোট ছোট বিদ'আতই এক সময় বড় হয়ে যায়। এই উম্মতের মধ্যে সৃষ্ট সকল বিদ'আতের কিন্তু একই অবস্থা। **প্রথমে ছোট ছিল, হক্কের সাথে যার মিল ছিল। ফলে সেখানে যোগদানকারীরা তার দ্বারা প্রতারিত হয়েছে। কিন্তু তারপর সেখান থেকে বের হওয়ার আর পথ পায়নি। অবশেষে তা বড় হয়ে দ্বীনে পরিণত হয়েছে, যাকে দ্বীন হিসেবে পালন করা হয়'**।[১৪]

এসব ভাসমান অস্পষ্ট নাম ও পরিভাষা ইসলাম ও মুসলিমদের উপর কত যে ক্ষতি ডেকে এনেছে। এসব সমসাময়িক দলাদলি ও জমায়েতও অনুরূপই। শুরুতে নিয়্যত থাকে ভালো; তারপর দলে-উপদলে পরিণত হয়ে সেগুলোই উদ্দীষ্ট হয়ে থাকে। তখনই 'জামা'আত বা সংগঠনের পক্ষে দলীল গ্রহণের জন্য কুরআন-হাদীছের বক্তব্যকে ব্যবহার করা হয়।...অথচ এটা উল্টো পদ্ধতি। শারঈ পদ্ধতি হচ্ছে, দলীল অনুযায়ী আমল করতে হবে'[১৫], কোনো প্রকার বিকৃতি ও অপব্যাখ্যা ছাড়াই।

'অতএব, -আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন- সমসাময়িক যে কারো যে কোনো কথার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন। তাড়াহুড়ো করে কারো কথার মধ্যেই প্রবেশ করবেন না, যতক্ষণ না এ প্রশ্ন করছেন: সেই বিষয়ে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো ছাহাবী বা কোনো আলেম কি কথা বলেছেন? যদি তাদের কারো পক্ষ থেকে কোনো বক্তব্য পেয়ে যান, তাহলে তা আঁকড়ে ধরুন। **এটা ছেড়ে অন্য কোনো দিকে ধাবিত হবেন না।** এর বাইরে অন্য কিছু বেছে নিয়ে জাহান্নামে নিপতিত হবেন না'।[১৬]

এখানে দু'টি বিষয়ে খুব গুরুত্ব দেওয়া জরুরী:

এক. মনের অতি আবেগ যদি কুরআন-সুন্নাহর দলীল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়, তাহলে তা ব্যক্তির জন্য অকল্যাণ ও ধ্বংস বয়ে আনে।

কল্যাণের প্রতি ভালোবাসা, ইসলামের জন্য কাজ করার প্রতি ভালোবাসা এবং আল্লাহর দিকে দাওয়াতের প্রতি ভালোবাসা— সবই কিন্তু শারঈ দলীলের মানদণ্ডে মাপতে হবে। 'বেশি ভালো' বা 'তড়িৎ ফলাফল' বা 'বিন্যাস' বা 'ব্যবস্থাপনা' বা 'সংগঠন'— তাদের এসব ধারণার উপর ভিত্তি করে দলীল থেকে বের হয়ে অন্য কোনো দিকে যাওয়া যাবে না।

শরী'আতে যা এসেছে, তা ছাড়া অন্য কোনো বিন্যাস চলবে না।

শ্রেষ্ঠসৃষ্টির পক্ষ থেকে যা বিশুদ্ধসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে, তার বাইরে অন্য কোনো ব্যবস্থাপনা চলবে না।

তিনি ইসলামে আমাদের নিকট যে সমন্বয় এনেছেন, তার বাইরে কোনো সমন্বয় চলবে না।

দুই. আল্লাহর বান্দা! আপনি যে কাজে আপতিত হয়ে তাকে শারঈ কাজ ভাবছেন, অথচ তা বিদ'আতী কাজ, সে ব্যাপারে নিজেকে পরীক্ষা করুন এভাবে:

(ক) আপনার দলের বাইরের অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন ও অধিক জ্ঞানী কোনো আলেমের দিকে কি আপনি ততটা ধাবিত হন, যতটা ধাবিত হন আপনার দলের অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতাসম্পন্ন ও অল্প জ্ঞানী আলেমের দিকে?

(খ) কল্যাণের কাজ, আল্লাহর দিকে দাওয়াত, ইসলামের পথে চলা— এগুলো কি আপনি ঈমানী তাগিদে করেন নাকি এগুলোর পেছনে আপনার দলের নির্দেশ[১৭], আপনার সভাপতির নির্দেশনা এবং আপনার নেতার দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে?

(গ) আপনি কি ইসলামের নিয়ম-কানুন, এর আদেশ-নিষেধের প্রতি সেভাবে যত্নশীল হতে পারেন, যতটা যত্নশীল হতে পারেন আপনার দলের নিয়ম-কানুন মানার প্রতি, আপনার জামা'আতের সভা-সমাবেশ এবং আপনার দলের নির্ধারিত সময় ও স্থানে উপস্থিত হওয়ার প্রতি?

প্রিয় ভাই আমার! আমি আপনার জবাবের অপেক্ষা করছি না। ...কথায় বলে, 'প্রত্যেকটি মানুষ তার নিজের হিসাবকারী'।

অতঃপর আপনার মোটেও এ ধারণা করা ঠিক হবে না যে, দলাদলি শুধু প্রতীক ও শ্লোগান বা বায়'আত ও ইমারতের নাম। বরং তা প্রয়োগ, লেনদেন ও পরিচালনার নাম।

অতএব, যার নাম দল, সংগঠন বা জামা'আত, কেবল তা দল নয়— যেমনটা কেউ কেউ মনে করে থাকে।

'আর একথা সুবিদিত যে, ঐসব গোলযোগ বাস্তবতার সাথে সম্পর্কিত, যা নাম ও বাহ্যিক রূপ পরিবর্তন করলে দূর হওয়ার নয়'।[১৮] ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ 'মহান আল্লাহ অন্তরসমূহের কথা সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত' *(আলে ইমরান, ৩/১৫৪)*।

(চলবে)

---

১৩. ইবনুল ক্বাইয়িম, 'ইগাছাতুল লাহফান, ১/৩৪৯।
১৪. বারবাহারী, 'শারহুস সুন্নাহ', নং ৫।
১৫. হুকমুল ইনতিমা, পৃ. ১৩৭।
১৬. শারহুস সুন্নাহ, নং ৫।
১৭. এখানে আমি আপনার ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা উঠাচ্ছি না। 'কারণ বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যৌথ কর্মকে লক্ষ্যবস্তু বানানো দাওয়াতী ময়দানের একটি ভ্রান্ত পথ'!! যেমনটি শায়খ আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক 'মাজাল্লাতুল ফুরক্বান'-এর ১৭ সংখ্যার ২৪ পৃষ্ঠায় বলেছেন।
১৮. ইগাছাতুল লাহফান, ১/৩৫৩।

অহীর বাস্তবতা বিশ্লেষণ (১৯তম পর্ব)

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

(মিন্নাতুল বারী- ২৬তম পর্ব)

[যে হাদীছের ব্যাখ্যা চলছে :

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ الحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ، وَكَانُوا تُجَّارًا بِالشَّأْمِ فِي المُدَّةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَادَّ فِيهَا أَبَا سُفْيَانَ وَكُفَّارَ قُرَيْشٍ، فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِيلِيَاءَ، فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ، وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ، ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا بِتَرْجُمَانِهِ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا، فَقَالَ: أَدْنُوهُ مِنِّي، وَقَرِّبُوا أَصْحَابَهُ فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ، فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ. فَوَاللَّهِ لَوْلاَ الحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْثِرُوا عَلَيَّ كَذِبًا لَكَذَبْتُ عَنْهُ. ثُمَّ كَانَ أَوَّلَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ: كَيْفَ نَسَبُهُ فِيكُمْ؟ قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ، قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا القَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ؟ قُلْتُ: لاَ قَالَ: فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ فَقُلْتُ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ. قَالَ: أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ قُلْتُ: بَلْ يَزِيدُونَ. قَالَ: فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قُلْتُ: لاَ، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لاَ نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا، قَالَ: وَلَمْ تُمْكِنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرُ هَذِهِ الكَلِمَةِ، قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ قُلْتُ: الحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالٌ، يَنَالُ مِنَّا وَنَنَالُ مِنْهُ. قَالَ: مَاذَا يَأْمُرُكُمْ؟ قُلْتُ: يَقُولُ: اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّدْقِ وَالعَفَافِ وَالصِّلَةِ. فَقَالَ لِلتَّرْجُمَانِ: قُلْ لَهُ: سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَبٍ، فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا. وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا القَوْلَ، فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا القَوْلَ قَبْلَهُ، لَقُلْتُ رَجُلٌ يَأْتَسِي بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ، فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، قُلْتُ فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ، قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ، وَسَأَلْتُكَ، هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ، فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ. وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ، فَذَكَرْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمُ اتَّبَعُوهُ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ. وَسَأَلْتُكَ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ، فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلِكَ أَمْرُ الإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ. وَسَأَلْتُكَ أَيَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ، فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ القُلُوبَ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ، فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لاَ تَغْدِرُ. وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ، فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الأَوْثَانِ، وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلاَةِ وَالصِّدْقِ وَالعَفَافِ، فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ. ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي بَعَثَ بِهِ دِحْيَةُ إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى، فَدَفَعَهُ إِلَى هِرَقْلَ، فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ: سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلاَمِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الأَرِيسِيِّينَ " وَ {يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لاَ نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ، وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الكِتَابِ، كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّخَبُ وَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ وَأُخْرِجْنَا، فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا: لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ، إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ. فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيَّ الإِسْلاَمَ.

وَكَانَ ابْنُ النَّاظُورِ، صَاحِبُ إِيلِيَاءَ وَهِرَقْلَ، سُقُفًّا عَلَى نَصَارَى الشَّأْمِ يُحَدِّثُ أَنَّ هِرَقْلَ حِينَ قَدِمَ إِيلِيَاءَ، أَصْبَحَ يَوْمًا خَبِيثَ النَّفْسِ، فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِقَتِهِ: قَدِ اسْتَنْكَرْنَا هَيْئَتَكَ، قَالَ ابْنُ النَّاظُورِ: وَكَانَ هِرَقْلُ حَزَّاءً يَنْظُرُ فِي النُّجُومِ، فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوهُ: إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ حِينَ نَظَرْتُ فِي النُّجُومِ مَلِكَ الخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ، فَمَنْ يَخْتَتِنُ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ؟ قَالُوا: لَيْسَ يَخْتَتِنُ إِلَّا اليَهُودُ، فَلاَ يُهِمَّنَّكَ شَأْنُهُمْ، وَاكْتُبْ إِلَى مَدَايِنِ مُلْكِكَ، فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ اليَهُودِ. فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ، أُتِيَ هِرَقْلُ بِرَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ يُخْبِرُ عَنْ خَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا اسْتَخْبَرَهُ هِرَقْلُ قَالَ: اذْهَبُوا فَانْظُرُوا أَمُخْتَتِنٌ هُوَ أَمْ لاَ، فَنَظَرُوا إِلَيْهِ، فَحَدَّثُوهُ أَنَّهُ مُخْتَتِنٌ، وَسَأَلَهُ عَنِ العَرَبِ، فَقَالَ: هُمْ يَخْتَتِنُونَ، فَقَالَ هِرَقْلُ: هَذَا مُلْكُ هَذِهِ الأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ. ثُمَّ كَتَبَ هِرَقْلُ إِلَى صَاحِبٍ لَهُ بِرُومِيَةَ، وَكَانَ نَظِيرَهُ فِي العِلْمِ، وَسَارَ هِرَقْلُ إِلَى حِمْصَ، فَلَمْ يَرِمْ حِمْصَ حَتَّى أَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِبِهِ يُوَافِقُ رَأْيَ هِرَقْلَ عَلَى خُرُوجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَنَّهُ نَبِيٌّ، فَأَذِنَ هِرَقْلُ لِعُظَمَاءِ الرُّومِ فِي دَسْكَرَةٍ لَهُ بِحِمْصَ، ثُمَّ أَمَرَ بِأَبْوَابِهَا فَغُلِّقَتْ، ثُمَّ اطَّلَعَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الرُّومِ، هَلْ لَكُمْ فِي الفَلاَحِ وَالرُّشْدِ، وَأَنْ يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ، فَتُبَايِعُوا هَذَا النَّبِيَّ؟ فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمُرِ الوَحْشِ إِلَى الأَبْوَابِ، فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِّقَتْ، فَلَمَّا رَأَى هِرَقْلُ نَفْرَتَهُمْ، وَأَيِسَ مِنَ الإِيمَانِ، قَالَ: رُدُّوهُمْ عَلَيَّ، وَقَالَ: إِنِّي قُلْتُ مَقَالَتِي آنِفًا أَخْتَبِرُ بِهَا شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ، فَقَدْ رَأَيْتُ، فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ، فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأْنِ هِرَقْلَ رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، وَيُونُسُ، وَمَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.

হাদীছের সাথে অধ্যায়ের সম্পর্ক :

অধ্যায় হচ্ছে অহী সংশ্লিষ্ট। অহীর সাথে এই লম্বা হাদীছের সম্পর্ক কী? মুহাক্কিক্ব মুহাদ্দিছগণ বলেছেন, এই হাদীছে অহী গ্রহণকারী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সত্যতা তৎকালীন সুপার পাওয়ার রোমান সাম্রাজ্যের অধিপতি হিরাক্লিয়াসের দরবারে হিরাক্লিয়াসের নিজের মুখ থেকে ও মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর তৎকালীন প্রধান শত্রু আবূ সুফিয়ান রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছে। মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নবী হওয়ার এই রাজকীয় সত্যায়ন তৎকালীন যুগের সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি ছিল। যা প্রমাণ করে, মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে অহীর আগমন সত্য। আর এটাই এই হাদীছের সাথে অধ্যায়ের সম্পর্ক।

হাদীছের ব্যাখ্যা :

হাদীছ ও কুরআনে উল্লিখিত রোম এবং বর্তমান ইতালির রোম কি এক?

রোমান সাম্রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত। ইতালির রোমকেন্দ্রিক এবং তুরস্কের ইস্তাম্বুল বা কনস্টান্টিনোপল কেন্দ্রিক। কনস্টান্টিনোপল কেন্দ্রিক রোমান সাম্রাজ্য বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য হিসেবে পরিচিত। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য ও রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে অন্যতম পার্থক্য হচ্ছে বাইজেন্টাইনগণ অর্থোডক্স খ্রিষ্টান

* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; বি. এ (অনার্স), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এমএসসি, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য।

আর রোমানগণ ক্যাথলিক খ্রিষ্টান। ক্যাথলিকদের দৃষ্টিতে বড়দিন ২৫ ডিসেম্বর আর অর্থোডক্সদের দৃষ্টিতে ৭ জানুয়ারি। ক্যাথলিকগণ তাদের ধর্মগুরুকে পোপ বলে থাকে আর অর্থোডক্সগণ তাদের ধর্মগুরুকে প্যাট্রিয়ক বলে থাকে, যেমনটা আমাদের আলোচিত হাদীছে আমরা দেখেছি।

রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর যুগে রোমান সাম্রাজ্যের অধিপতি হিসেবে যে হিরাক্লিয়াসের বর্ণনা পাওয়া যায়, তারা মূলত অর্থোডক্স বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের অধিপতি। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে হাদীছে ও কুরআনে যখন রোম বলা হয়েছে, তৎকালীন ইতিহাস অনুযায়ী সেটা ইস্তাম্বুলকেন্দ্রিক বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য উদ্দেশ্য। যদিও স্বাভাবিকভাবে রোম বলতে ইতালির রাজধানী রোমকেই বুঝায়। কেননা রোমানদের ইতিহাস এখান থেকেই শুরু হয়। পরবর্তীতে তা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। ওয়াল্লাহু আ'লামু বিছ ছওয়াব।

হিরাক্লিয়াসের হিকমত :

উক্ত সম্পূর্ণ ঘটনায় কয়েকভাবে হিরাক্লিয়াসের হিকমত বা বুদ্ধিমত্তা ফুটে উঠেছে—

(১) হিরাক্লিয়াসের কাছে মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর চিঠি আসার পর তিনি সরাসরি সেই চিঠি খুলে পড়তে শুরু করেননি। বরং সর্বপ্রথম জানার চেষ্টা করেছেন চিঠিটি কার পক্ষ থেকে এসেছে। তারপর প্রেরকের বিষয়ে বিস্তারিত খবর নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। সকল কিছু সম্পর্কে জেনে তিনি তার চিঠি পড়েছেন। আর বিজ্ঞ, জ্ঞানী ও দূরদর্শী ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য এমনই হয়ে থাকে। তারা না বুঝে না জেনে কোনো পদক্ষেপই গ্রহণ করেন না। বরং প্রতিটি পদক্ষেপের আগে সে বিষয়ে ভালোভাবে জানার চেষ্টা করেন।

(২) কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে জানার জন্য সবচেয়ে উত্তম উপায় হচ্ছে, তার যতটা কাছের মানুষের মাধ্যমে তার বিষয়ে জানা যায়। হিরাক্লিয়াস কুরাইশদের দলকে ডাকার পর সরাসরি তাদের সাথে কথা শুরু করেননি। বরং তাদের মধ্যে কে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর বংশের দিক থেকে বেশি নিকটবর্তী তা জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছেন। তারপর আবূ সুফিয়ান রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর সাথে কথা শুরু করেছেন। শুধু তাই নয়, আবূ সুফিয়ান রাযিয়াল্লা-হু আনহু কোনো ভুল তথ্য দিলে তার সঙ্গী-সাথীগণ যেন সেই ভুল তথ্যের প্রতিবাদ করতে পারে এই জন্য তার সঙ্গী-সাথীদেরকে তার পাশে না বসিয়ে তার পিছনে বসিয়েছেন। কেননা অনেক সময় পাশে থাকলে এবং চোখাচোখি হলে চেহারার দিকে তাকিয়ে বিরোধিতা করতে লজ্জা হতে পারে। অথবা চোখের ইশারায় নিজের লোকজনকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। তাই হিরাক্লিয়াস দলনেতার সাথে দলের বিচ্ছিন্নতা তৈরি করে দিলেন, যাতে তাদের মধ্যে ইশারায় কোনো প্রকার যোগাযোগ সম্ভব না হয়। ফলত, মানসিকভাবে তাদের জন্য রাস্তা তৈরি থাকল, যাতে আবূ সুফিয়ান মিথ্যা বললে তার বিরোধিতা করতে তাদের ইতস্ততবোধ না হয়। পাশাপাশি তার সঙ্গী-সাথীদেরকে আবূ সুফিয়ান থেকে সম্পূর্ণ আলাদাও করেননি, যাতে করে আবূ সুফিয়ান একাই নিজের মনগড়া কোনো বক্তব্য দিতে না পারে। সে কোনো মিথ্যা বললে সকল মানুষ যাতে সেই মিথ্যার সাক্ষী থাকে। প্রতিবাদ করতে না পারলেও যাতে তাদের নেতার মিথ্যা তাদের সামনে প্রমাণিত হয়ে থাকে। এ সকল ব্যবস্থাপনাই ছিল বাদশাহ হিরাক্লিয়াসের দূরদর্শিতা, বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার প্রমাণ।

আবূ সুফিয়ান রাযিয়াল্লা-হু আনহু কীভাবে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকটবর্তী?

আবূ সুফিয়ান রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর পূর্ণ নাম হচ্ছে আবূ সুফিয়ান ইবনু হারব ইবনে ছখর ইবনে আবদে শামস ইবনে আবদে মানাফ। আমাদের নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর পূর্ণ নাম হচ্ছে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম ইবনে আবদে মানাফ। তথা তারা রক্তের চাচাতো ভাই। আমাদের নবী ও আবূ সুফিয়ানের তৃতীয় পুরুষ পরস্পর আপন ভাই। আবদে মানাফের দুই পুত্র আবদে শামস ও হাশেম।

আবূ সুফিয়ান রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর নামের শেষে 'রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু' বলা যাবে কি?

আবূ সুফিয়ান রাযিয়াল্লা-হু আনহু যেহেতু আবূ জাহলের পরে কাফেরদের সরদার ছিলেন এবং বহু যুদ্ধে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন, সেহেতু অনেকের মনের মধ্যে অনেক সময় সন্দেহ কাজ করে যে, তার নামের শেষে কি 'রাযিয়াল্লাহু' বলা যাবে কি-না? বিশেষ করে তার কাফের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা বলার সময় কী করা হবে?

উক্ত প্রশ্নের সঠিক উত্তর হচ্ছে, আমরা দেখব আমাদের সালাফগণ কী করেছেন। ছহীহ বুখারীর হাদীছে ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু আবূ সুফিয়ান রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণনা করার সময় তার নামের শেষে 'রাযিয়াল্লাহু' পড়েছেন।[১] ইবনু হাজার আসক্বালানী ও ইমাম নববী রাহিমাহুমাল্লাহ-সহ যারাই তার জীবনী বর্ণনা করেছেন, তারা সকলেই তার নামের সাথে 'রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু' উল্লেখ করেছেন।[২] আর ইসলামের নিয়ম হচ্ছে, ইসলাম তার পূর্বের সকল গুনাহকে ধ্বংস করে দেয়।

---

১. ছহীহ বুখারী, 'যাকাত' অধ্যায়ের প্রথমে।

২. তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, ২/২৩৯।

আর আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর একজন ছাহাবী হিসেবে তিনি তার পরবর্তী জীবনে কী পরিমাণ খেদমত করেছেন আর আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে কী পরিমাণ ভালোবাসতেন, তা আমরা তার জীবনীতে আলোচনা করেছি।

সেই যুগের কাফের ও আজকের মুসলিম :

উক্ত হাদীছ থেকে অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, আবূ সুফিয়ান রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু -এর সততা। আবূ সুফিয়ান রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু কাফের হওয়া সত্ত্বেও নিজের চরম শত্রু, যাকে হত্যা করতে পারা আবূ সুফিয়ানের জন্য সফলতা, যার সাথে রাত-দিনের যুদ্ধ সেই পরম শত্রুর ব্যাপারে তিনি কাফের হওয়া সত্ত্বেও একটা অক্ষরও মিথ্যা বলেননি। অথচ চাইলে মিথ্যা বলতে পারতেন। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আবূ সুফিয়ান রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু -এর মতো সততা আজকে মুসলিম সমাজে পাওয়া দুষ্কর। আজকে মুসলিমরা রাজনীতির কারণে, মাযহাব আলাদা হওয়ার কারণে, সুনাম ও সুখ্যাতির জন্য, হিংসার কারণে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে, প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে, বন্ধুর বিরুদ্ধে, আলেম হয়ে আলেমের বিরুদ্ধে অবলীলায় মিথ্যা বলে যাচ্ছে। ধারণাপ্রসূত মন্তব্য করে বিরোধী পক্ষকে পচানোই যেন আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পরিণত হয়েছে। এই জন্য মহান আল্লাহ আমাদের হাতে নেতৃত্ব প্রদান করেন না। কেননা মিথ্যার মতো সংকীর্ণ যাদের হৃদয়, তারা নেতৃত্বের প্রশস্ত কোনো কিছুর ভার বহন করার অযোগ্য। ইসলামের দৃষ্টিতে কুটচাল কখনোই নেতৃত্ব নয়। সত্যের উপর স্পষ্টভাবে অটল থেকে সকল কিছুর মোকাবিলা করার মতো হিম্মত যার আছে, একমাত্র তাদেরকেই মহান আল্লাহ সত্যের নেতৃত্ব দিবেন, সম্মান ও মর্যাদার নেতৃত্ব দিবেন।

চিঠি লেখার নিয়ম ও সুন্নাত :

(১) 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' দিয়ে শুরু করা : রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম হিরাক্লিয়াসসহ যত বাদশাহর কাছে ইসলামের দাওয়াতপত্র পাঠিয়েছিলেন সকল চিঠির শুরুতে সম্পূর্ণ 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' লিখেছিলেন। সুতরাং আমরা বলতে পারি, চিঠির শুরুতে সম্পূর্ণ বিসমিল্লাহ লেখা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর সুন্নাত। অনেকেই চিঠিপত্রের শুরুতে বিসমিল্লাহ এর পরিবর্তে ৭৮৬ লিখে থাকেন। তাদের দাবি হচ্ছে, বিসমিল্লাহ লিখলে অনেক সময় যার কাছে লেখাটি যায় তিনি সেটার যথাযথ সম্মান রক্ষা করতে পারবেন কি-না তার নিশ্চয়তা নাই। তাই মহান আল্লাহর নামের সম্মান রক্ষার্থে বিসমিল্লাহ এর পরিবর্তে ৭৮৬ লেখার পক্ষে তারা। তাদের এই দাবির উত্তর হচ্ছে, স্বয়ং রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম যাদের কাছে চিঠি লিখেছিলেন তারা কাফের ছিল এবং তারা মহান আল্লাহর নামের সম্মান রক্ষা করবে এই মর্মে কোনো নিশ্চয়তা ছিল না; বরং পারস্যের বাদশাহ তো রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর চিঠি ছিড়ে ফেলে দিয়েছিলেন, যেই চিঠিতে বিসমিল্লাহ লেখা ছিল। সুতরাং এই ঘটনা প্রমাণ করে, চিঠি লেখকের দায়িত্ব হচ্ছে বিসমিল্লাহ লেখা। আর যার কাছে চিঠি যাচ্ছে, তার দায়িত্ব হচ্ছে সেটার সম্মান রক্ষা করা। যদি সে সম্মান রক্ষা করতে না পারে তাহলে সেটা তার দোষ। সেটা কখনোই লেখকের উপরে বর্তাবে না। সুতরাং সেই ভয়ে বিসমিল্লাহ লেখা বন্ধ করে তার পরিবর্তে ৭৮৬ লেখা নতুন বিদআত। শুধু চিঠি নয়; বরং অন্য কোথাও বিসমিল্লাহ-এর পরিবর্তে ৭৮৬ এই সংখ্যা লেখা মোটেও সমীচীন নয়। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক বুঝার তাওফীক্ব দান করুন।

উল্লেখ্য, অনেকেই এই জায়গায় হুদায়বিয়ার সন্ধির উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির শুরুতে 'বিইসমিহি আল্লাহুম্মা' লেখা হয়েছে। তবে সত্য হচ্ছে, হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্রের শুরুতেও রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' লেখার জন্য বলেছিলেন। কিন্তু মক্কার কুরাইশদের চাপে সেটা পরিবর্তন করে 'বিইসমিহি আল্লাহুম্মা' লেখা হয়। যেমনটা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর পরিবর্তে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ লেখা হয়েছিল। যেহেতু সেটা উভয়পক্ষের সম্মতিতে লিখিত চুক্তিপত্র ছিল, সেহেতু সেটা দলীল হিসেবে পেশ করা গ্রহণযোগ্য হবে না। তার পরিবর্তে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর একক আমল আমাদের সামনে স্পষ্ট।

(২) চিঠির শুরুতে প্রেরকের নাম : চিঠির শুরুতে প্রথমে প্রেরকের নাম লেখা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর সুন্নাত। যেমনটা আমরা হিরাক্লিয়াসের উদ্দেশ্যে লেখা চিঠিতে দেখলাম। শুধু হিরাক্লিয়াস নয়; বরং রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর সকল চিঠিতে তিনি প্রথমে তার নিজের নাম লিখেছেন তারপর প্রাপকের নাম লিখেছেন। ছাহাবায়ে কেরামও এই সুন্নাতেরই অনুসরণ করতেন।

দলীল : ১

عَنْ سَلْمَانَ يَعْنِي الْفَارِسِيَّ قَالَ مَا كَانَ أَحَدٌ أَعْظَمَ حُرْمَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ أَصْحَابُهُ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ كِتَابًا كَتَبُوا مِنْ فُلَانٍ إِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

সালমান রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দুনিয়ার কোনো মানুষ আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর চেয়ে বেশি সম্মান পাওয়ার যোগ্য নয়। তারপরও তার ছাহাবীরা যখন চিঠি লিখতেন, তখন লিখতেন উমুকের পক্ষ থেকে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি।[৩]

---

৩. মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হা/১৩১৭১।

দলীল : ২

عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ الْعَلَاءِ يَعْنِي ابْنَ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَدَأَ بِاسْمِهِ.

ইবনু সীরীন রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি আলা আল-হাযরামী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যখন তিনি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উদ্দেশ্যে চিঠি লিখতেন, তখন তিনি নিজের নাম দিয়ে শুরু করতেন।[৪]

(৩) শুরুতে প্রাপকের নামও লেখা যায় : তবে তার মানে এই নয় যে, প্রাপকের নাম প্রথমে দিয়ে চিঠি শুরু করা যাবে না। বরং ছাহাবীগণের মধ্যে প্রাপকের নাম প্রথমে দিয়েও চিঠি লেখার দলীল পাওয়া যায়। যথা—

দলীল : ১

আব্দুল্লাহ ইবনু দীনার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَمَّا بَايَعَ النَّاسُ عَبْدَ المَلِكِ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ المَلِكِ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ إِنِّي أُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ المَلِكِ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ فِيمَا اسْتَطَعْتُ وَإِنَّ بَنِيَّ قَدْ أَقَرُّوا بِذَلِكَ.

অর্থাৎ যখন মানুষ আব্দুল মালিক ইবনু মারওয়ান রাহিমাহুল্লাহ-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করল, তখন আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা একটি চিঠি লিখে পাঠালেন যা ছিল নিম্নরূপ, আমীরুল মুমিনীন আব্দুল মালিক ইবনু মারওয়ানের প্রতি, আমি এবং আমার পরিবার আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের অনুসরণে আব্দুল মালিক ইবনু মারওয়ানের আনুগত্যের স্বীকৃতি প্রদান করছি।[৫]

দলীল : ২

যায়েদ ইবনু ছাবেত রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِعَبْدِ اللَّهِ مُعَاوِيَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ؛ فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّكَ تَسْأَلُنِي عَنْ مِيرَاثِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ.

তিনি আমীরুল মুমিনীন মুআবিয়া রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর নিকট চিঠি লিখেছিলেন এইভাবে— বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। আল্লাহর বান্দা আমীরুল মুমিনীন মুআবিয়ার নিকটে যায়েদ ইবনু ছাবেত এর পক্ষ থেকে। আপনার প্রতি সালাম এবং আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি মহান আল্লাহর প্রশংসা করত, শুরু করছি যিনি ব্যতীত কোনো সত্যিকার মা'বূদ নাই। পরকথা এই যে, আপনি আমার নিকটে দাদা ও ভাইয়ের ওয়ারিছ সম্পত্তি বণ্টন সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন।[৬]

এই হাদীছ উল্লেখ করার পর ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَبْدَأَ الرَّجُلُ بِصَاحِبِهِ قَبْلَ نَفْسِهِ فِي الْكِتَابِ অর্থাৎ 'মানুষ তার নিজের নাম দিয়েও চিঠি শুরু করতে পারে এতে কোনো সমস্যা নাই'।[৭]

(৪) সালাম প্রদান করা : চিঠির অন্যতম সুন্নাত হচ্ছে সালাম প্রদান করা। এমনকি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অমুসলিম রাজা বাদশাহগণের নিকট চিঠি লেখার সময়ও সালাম প্রদান করেছেন। তবে তার ভাষা ছিল ভিন্ন। যেমনটা আমরা হাদীছে লক্ষ করেছি। তিনি লিখেছেন, 'সালামুন আলা মানিত্তাবা'আল হুদা' তথা 'তাদের উপর সালাম বর্ষিত হোক যারা হেদায়াতের উপর আছে'।

(৫) সম্মানের সাথে সম্বোধন : চিঠি লেখার অন্যতম যে সুন্নাতটি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্ত চিঠি থেকে আমরা শিখতে পারি, তা হচ্ছে সম্মানের সাথে সম্বোধন। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন কাফের বাদশাহর উদ্দেশ্যে চিঠি লেখার ক্ষেত্রেও তাকে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করেছেন। তিনি লিখেছেন, إلى هرقْلَ عظيم الروم অর্থাৎ 'রোমের মহান হিরাক্লিয়াসের প্রতি'। আল্লাহ তাআলা কোথাও কাফের-মুশরেকদেরকে সম্বোধন করতে গিয়ে কাফের-মুশরেক বলে সম্বোধন করেননি, বরং সম্মানের সাথে সম্বোধন করেছেন। হয় তিনি বলেছেন, হে মানবজাতি; আর মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় সম্মান হচ্ছে তার মানুষ পরিচয়। অথবা তিনি বলেছেন, হে আহলে কিতাব; আর ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদের জন্য সবচেয়ে সম্মানের হচ্ছে তাদের নিকট নবী এসেছিল, আল্লাহর কিতাব এসেছিল। মহান আল্লাহ সেই সম্মান দিয়েই তাদেরকে সম্বোধন করেছেন। অথবা তিনি বনূ ইসরাঈল বলেছেন; আর ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদের জন্য সবচেয়ে বড় সম্মানের হচ্ছে যে, তারা ইসরাঈল তথা ইসহাক্ব আলাইহিস সালাম-এর অনুসারী হওয়ার দাবি করে। সুতরাং মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমাদের যে শিক্ষা নিতে হবে তা হচ্ছে, দাওয়াতের ক্ষেত্রে ভদ্রতা ও নম্রতা বজায় রাখা। যেখানে ফেরাউনের মতো কাফেরের সাথে মূসা আলাইহিস সালাম-এর মতো নবীকে ভালো ব্যবহারের আদেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে আমরা কীভাবে মুসলিমদের মধ্যে দাওয়াতী কাজ করতে গিয়ে তাদেরকে খারাপ ভাষায় সম্বোধন করতে পারি?

(চলবে)

৪. আবূ দাঊদ, হা/ ৫১৩৫-৫১৩৪।

৫. ছহীহ বুখারী, হা/৭২০৫।

৬. আল-আদাবুল মুফরাদ, হা/১১৩১।

৭. মুওয়াত্ত্বা মুহাম্মাদ, হা/৯০১।

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ঈমানের আলো ও মুনাফেক্বীর অন্ধকার

মূল : ড. সাঈদ ইবনু আলী ইবনু ওয়াহাফ আল-ক্বাহত্বানী রাহিমাহুল্লাহ

*অনুবাদ : হাফীযুর রহমান বিন দিলজার হোসাইন**

(পর্ব-৩)

(১৬) বিশুদ্ধ ঈমান সন্দেহ ও সংশয় দূর করে এবং সমস্ত সন্দেহ প্রতিরোধ ও ছিন্ন করে। যেগুলো অধিকাংশ মানুষের সামনে এসে তাদের দ্বীনের মধ্যে ক্ষতি করে। মানুষ ও জিন শয়তান এবং কুমন্ত্রণা দানকারী আত্মা যে সংশয় ঢুকিয়ে দেয়, সে সংশয় রোগের কোনো ঔষধ নেই ঈমান বাস্তবায়ন ছাড়া। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾ ‘মুমিন কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি’ *(আল-হুজুরাত, ৪৯/১৫)*। এই কুমন্ত্রণাগুলোর প্রতিকার চারটি বিষয়ের মাধ্যমে হয়:

(ক) এই শয়তানী কুমন্ত্রণাগুলো থেকে বিরত থাকা।

(খ) এই কুমন্ত্রণাগুলো যে ঢুকিয়ে দিয়েছে, তার থেকে আশ্রয় চাওয়া। সে হলো শয়তান।

(গ) শক্তভাবে ঈমান ধারণ করা। সুতরাং সে বলবে, آمَنْتُ بِاللهِ ‘আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি’।

(ঘ) এগুলোর ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করা থেকে বিরত থাকা’।[১]

(১৭) আল্লাহর প্রতি ঈমান মুমিনদের আশ্রয়স্থল, তাদের কাছে যা আসে তার সর্বক্ষেত্রে। যেমন আনন্দ, দুঃখ, ভয়, নিরাপত্তা, আনুগত্য, অবাদ্ধতা আরো অন্যান্য বিষয়, যেগুলো প্রতিটি মানুষের জীবনে অনিবার্য। সুতরাং পছন্দনীয় বিষয় ও আনন্দের সময় তারা ঈমানের আশ্রয় নেয়। তাই তারা আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান গায় এবং নেয়ামতরাজিকে পছন্দনীয় ক্ষেত্রে ব্যবহার করে। একইভাবে কষ্ট ও দুশ্চিন্তার সময় কয়েক দিক থেকে ঈমানের আশ্রয় নেয়: তারা তাদের ঈমান ও ঈমানের মাধুর্যে বিনোদিত হয় এবং এর উপর যে ছওয়াব সাব্যস্ত হয় তা নিয়ে প্রশান্ত হয়। তারা দুঃখ-চিন্তার মোকাবিলা করে প্রশান্ত অন্তর ও (হায়াতে ত্বায়্যেবা) পবিত্র জীবনে প্রতাবর্তনের মাধ্যমে, যা দুঃখ-চিন্তাকে দূর করে। ভয়ের সময় তারা ঈমানের আশ্রয় নেয়। ঈমানের কাছে প্রশান্তি পায় এবং এটা তাদের ঈমান, দৃঢ়তা, মযবূত ও সাহসিকতা বৃদ্ধি করে। তাদের নিকট আপতিত ভয় দূর হয়। ছাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ - فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللهِ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾ ‘যাদেরকে মানুষেরা বলেছিল যে, নিশ্চয়ই লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে। সুতরাং তাদেরকে ভয় করো। কিন্তু তা তাদের ঈমান বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তারা বলেছিল, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক! অতঃপর তারা ফিরে এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নেয়ামত ও অনুগ্রহসহ। কোনো মন্দ তাদেরকে স্পর্শ করেনি এবং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করেছিল। আর আল্লাহ মহাঅনুগ্রহশীল’ *(আলে ইমরান, ৩/১৭৩-১৭৪)*।

(১৮) বিশুদ্ধ ঈমান বান্দাকে ধ্বংসাত্মক বিষয়মূহে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ‘কোনো ব্যভিচারী মুমিন অবস্থায় ব্যভিচার করে না এবং কোনো চোর মুমিন অবস্থায় চুরি করে না। কোনো মদ্যপায়ী মুমিন অবস্থায় মদ পান করে না’।[২] আর এটা যার মধ্যে ঘটেছে, তা তার দুর্বল ঈমান, তার নূর (আলোর) বিলুপ্তি ও আল্লাহর প্রতি লজ্জাশীলতা চলে যাওয়ার কারণে। এটা স্পষ্ট জানা বিষয়। কারণ বিশুদ্ধ সত্য ঈমানের সাথে থাকে আল্লাহর প্রতি লজ্জাশীলতা, তাঁর প্রতি ভালোবাসা, এর ছওয়াবের দৃঢ় আশা, শাস্তির ভয় ও নূর (আলো) অর্জনের আকাঙ্ক্ষা। এই বিষয়গুলো ব্যক্তিকে প্রতিটি কল্যাণকর কাজের আদেশ দেয় এবং প্রতিটি অকল্যাণ থেকে বাধা দেয়।

(১৯) সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি দুই প্রকার। তারা হলো ঈমানদারগণ। আবূ মূসা আল-আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ﴿مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الأُتْرُجَّةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ

* নারায়ণপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।

২. ছহীহ বুখারী, ‘অত্যাচার, ক্বিছাছ এবং লুণ্ঠন’ অধ্যায়, ‘মালিকের অনুমতি ব্যতীত লুটপাট করা’ অনুচ্ছেদ, ১/১৪৬, হা/২৪৭৫; ছহীহ মুসলিম, ‘ঈমান’ অধ্যায়, ‘গুনাহ দ্বারা ঈমানের ক্ষতি হয় এবং গুনাহে লিপ্ত থাকা অবস্থায় ঈমান থাকে না’ অনুচ্ছেদ, ১/৫৭, হা/৫৭ শব্দ বিন্যাস তাঁরই।

مَثَلُ التَّمْرَةِ لاَ رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِى لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ﴾ 'যে মুমিন কুরআন মাজীদ পাঠ করে, তার উদাহরণ হলো কমলালেবু- যা স্বাদে ও গন্ধে উত্তম। আর যে মুমিন কুরআন মাজীদ পাঠ করে না, তার উদাহরণ হলো খেজুর- যার সুগন্ধ না থাকলেও স্বাদে মিষ্ট। আর যে মুনাফেক্ব কুরআন পাঠ করে, তার উদাহরণ হলো রায়হানা ফুল- যার সুগন্ধি আছে এবং স্বাদ তিক্ত। আর যে মুনাফেক্ব কুরআন পাঠ করে না, তার উদাহরণ হলো হানযালা (মাকাল)- যার কোনো সুগন্ধি নেই এবং স্বাদে খুব তিক্ত'।[৩] সুতরাং মানুষ চার প্রকার:

প্রথম প্রকার : নিজের মধ্যে কল্যাণ আছে এবং তার কল্যাণ অন্যের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এটাই সর্বোত্তম প্রকার। এই প্রকার মুমিন, যে কুরআন শিখে, দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করে অতঃপর সে নিজের জন্য এবং অন্যের জন্য উপকারী হয়। যেখানেই থাকুক না কেন সে বরকতময়।

দ্বিতীয় প্রকার : নিজে ভালো, কল্যাণের অধিকারী। এই প্রকার মুমিনের কাছে এমন কোনো জ্ঞান থাকে না, যা অন্যের নিকট নিয়ে যাবে। এই দুই প্রকারের মুমিন সৃষ্টির সেরা। তাদের মধ্যে থাকা কল্যাণ তাদের অপূর্ণ ঈমানের দিকে ফিরে আসে এবং মুমিনদের অবস্থা অনুযায়ী তার উপকার অন্যের মাঝেও ছড়িয়ে পড়ে।

তৃতীয় প্রকার : যার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। কিন্তু তার ক্ষতি অন্যের দিকে ছড়ায় না।

চতুর্থ প্রকার : যার মধ্যে নিজের জন্য ও অন্যের জন্য অনিষ্টতা আছে। এটা হলো সবচাইতে নিকৃষ্ট প্রকার।

সুতরাং সমস্ত কল্যাণ ঈমান ও তার সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলির দিকে ফিরে আসে এবং অকল্যাণ ঈমান শূন্যতা ও ঈমানের বিপরীত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার দিকে ফিরে আসে'।[৪]

(২০) ঈমান যমীনে প্রতিনিধিত্ব এনে দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে আল্লাহ তাদেরকে এ মর্মে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি নিশ্চিতভাবে তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব প্রদান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব প্রদান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তিনি তাদের ভয়-ভীতি শান্তি-নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দিবেন। তারা আমারই ইবাদত করবে, আমার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না। আর এরপর যারা কুফরী করবে, তারাই ফাসেক্ব (পাপাচারী)' *(আন-নূর, ২৪/৫৫)*।

(২১) ঈমানের মাধ্যমে আল্লাহ বান্দাকে সহযোগিতা করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ 'আর মুমিনদের সাহায্য করা তো আমার কর্তব্য' *(আর-রূম, ৩০/৪৭)*।

(২২) ঈমান বান্দার জন্য সম্মান এনে দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلِلهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ 'কিন্তু সকল মর্যাদা তো আল্লাহর, তাঁর রাসূলের ও মুমিনদের; কিন্তু মুনাফেক্বরা তা জানে না' *(আল-মুনাফিকূন ৬৩/৮)*।

(২৩) ঈমান মুমিনদের উপর শত্রুদের আধিপত্যহীনতা এনে দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ 'আর আল্লাহ কখনো মুমিনদের বিপক্ষে কাফেরদের জন্য পথ রাখবেন না' *(আন-নিসা, ৪/১৪১)*।

(২৪) পরিপূর্ণ নিরাপত্তা ও সঠিক পথ প্রাপ্তি। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ 'যারা ঈমান এনেছে এবং স্বীয় ঈমানকে যুলুমের সাথে সংমিশ্রণ করেনি, তাদের জন্যই নিরাপত্তা এবং তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত' *(আল-আনআম, ৬/৮২)*।

(২৫) মুমিনদের চেষ্টা-পরিশ্রম সংরক্ষিত। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ 'নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, নিশ্চয়ই আমি কারো প্রতিদান নষ্ট করব না, যে সৎকর্ম করেছে' *(আল-কাহফ, ১৮/৩০)*।

(২৬) মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ 'আর যখনই কোন সূরা নাযিল করা হয়, তখন তাদের কেউ কেউ বলে, এটি তোমাদের কার ঈমান বৃদ্ধি করল? অতএব যারা মুমিন, নিশ্চয়ই তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা আনন্দিত হয়' *(আত-তওবা, ৯/১২৪)*।

(প্রবন্ধটির বাকী অংশ ১৯নং পৃষ্ঠায়)

---

৩. ছহীহ মুসলিম, 'কুরআনের মর্যাদাসমূহ ও এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়' অধ্যায়, হাফেযুল কুরআনের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ, ১/৫৪৯, হা/৭৯৭।

৪. সা'দী, আত-তাওযীহু ওয়াল বায়ান লি শাজারাতিল ঈমান, পৃ. ৬৩-৯০।

কুরআন ও বিজ্ঞানের আলোকে চোখের গুরুত্ব

*-মো. হারুনুর রশিদ**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

চোখের যত্নে ওযূর ভূমিকা : আল্লাহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ভালোবাসেন। কদর্যতা-মলিনতাকে তিনি পছন্দ করেন না। অপরিষ্কার দেহ সুস্থ থাকতে পারে না। শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিষ্কার রাখলে রোগজীবাণুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এ দৃষ্টিকোণে ওযূর গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ বলা হয়ে থাকে, পানি সর্বরোগের মহৌষধ। আগুনকে যেমন পানি দ্বারা নির্বাপিত করা যায়, তেমনি রোগজীবাণুকেও পানি দ্বারা অপসারিত করা যায়। চোখে ময়লা ঢুকলে কোনো পেনিসিলিন ইঞ্জেকশন পুশ করে ময়লা দূরীভূত করা যায় না। কোনো দেশি বা বিদেশি নামকরা টনিক সেবন করেও এসব পরিষ্কার করা চলে না। পরিষ্কারের জন্য পানিরই প্রয়োজন। এই পানিই ওযূর উপকরণ।

হাকেম মুহাম্মাদ তারেক মাহমূদ চাগহাঈর মতে, ওযূ করার পর যে অঙ্গগুলো ভিজে যায়, মেডিকেল সায়েন্স অনুযায়ী যদি এ অঙ্গগুলো আর্দ্র থাকে, তাহলে চোখের রোগ হতে মানুষ বেঁচে যায়। অন্যথা চোখের আর্দ্রতা কমে যাওয়ার ফলে রোগী ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে। দিনের মধ্যে বারবার ওযূর জন্য চেহারা ধৌত করার কারণে এর সৌন্দর্য বেড়ে যায়। ওযূর মাধ্যমে ভ্রুতে পানি লেগে যায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, ভ্রু ভেজা থাকলে চোখের এমন মারাত্মক রোগ হতে মানুষ নিজেকে রক্ষা করতে পারে, যেসব রোগের কারণে চোখের দৃষ্টিশক্তি পর্যায়ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে। আমাদের মধ্যে অনেকের চোখে ব্যথা হলে চোখে পানির ছিটা দেওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকি এটা একটা ভালো ব্যবস্থা। অথচ এ ব্যবস্থা প্রত্যেক মুসলিমের ওযূর মধ্যে নিহিত আছে। এর মাধ্যমে চোখের অসুখ কমে যায়। ধুলাবালি দূর হয়ে যায়।

ইউরোপের একজন ডাক্তার ‘চোখ, পানি ও স্বাস্থ্য’ নামে একটি প্রবন্ধ লিখে সেখানে তিনি প্রতিদিন কয়েকবার পানি দিয়ে চোখ ধোয়ার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি লিখেছেন, ‘তোমরা প্রতিদিন একাধিকবার মুখ ধৌত করো। অন্যথা তোমরা মারাত্মক চোখের রোগে আক্রান্ত হবে। অথচ এটা মুসলিমরা ওযূর মাধ্যমে দিনে কমপক্ষে পাঁচ বার করছেন। আল-হামদুলিল্লাহ!

একজন নিয়মিত ছালাত আদায়কারী বৃদ্ধই এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। যিনি ছালাতের জন্য দৈনিক পাঁচ বার ওযূ করেন। ৫০ বছরের বৃদ্ধ ব্যক্তি যেখানে ভালো করে দেখতে পারে না, সেখানে ১০০ বছরের বৃদ্ধ সুন্দর চেহারা, অটুট স্বাস্থ্য ও ভালো দৃষ্টিশক্তি নিয়ে অবলীলায় চলাফেরা করেন। এটাই ওযূর ইহকালীন নগদ পুরস্কার।[১]

কুদৃষ্টির ক্ষতি ও চিকিৎসা বিজ্ঞান : কুদৃষ্টির কারণে নানারকম রোগ দেখা দেয়। এক সেকেন্ডের কুদৃষ্টি হলেও সে দৃষ্টি মনকে দুর্বল করে দেয়। মনের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব জাগে। কেউ দেখে ফেলল কি-না এ চিন্তাও মনে আসে। মন দুর্বল হয়ে যায়। নানা কুচিন্তা মনকে আচ্ছন্ন করে। ঘনঘন পেশাবের বেগ হয়। স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে যায়। মনের মধ্যে ভূমিকম্পের ন্যায় পরিস্থিতি তৈরি হয়।

হঠাৎ দৃষ্টি পড়ার পর চোখ ফিরিয়ে নেওয়া হলেও মনে কাঁপন জাগে। কিন্তু এতে পাপ করার চিন্তা থাকে না।

গভীর দৃষ্টিতে দেখা চোখের জন্য ক্ষতিকর : কোনো জিনিসের প্রতি অপলক তাকিয়ে থাকাকে বলা হয় গভীর দৃষ্টিতে তাকানো। যারা অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার অভ্যাসের দাস হয়ে যায়, তাদের চোখের দৃষ্টি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাজেই কোনো জিনিসের প্রতি বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা আমাদের উচিত নয়। এ অভ্যাস থেকে বিরত থাকা উচিত। কারণ গভীর দৃষ্টিতে কারো প্রতি তাকিয়ে থাকার অভ্যাস ভালো নয়। এতে আমাদের চোখের দৃষ্টি দুর্বল হয়ে যাবে।

পুরুষ ও নারীদের উচিত দৃষ্টি নিচু করা : পুরুষ ও নারীদের কর্তব্য হচ্ছে তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি নিচু রাখে। বর্তমান সমাজে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, দৃষ্টির হেফাযত করা কঠিন হয়ে পড়েছে। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কুরআনে বর্ণিত দৃষ্টি নিচু রাখার যে আদেশ রয়েছে তার উপর আমল করতে হবে, তাতে মনের ভিতর মহান আল্লাহর ভয় জাগ্রত করতে হবে। চিন্তা করতে হবে যে, মহান আল্লাহ আমাকে দেখছেন। মহান আল্লাহর ভয় মনে যত বেশি জাগ্রত হবে, পাপ ও অন্যায় থেকে আত্মরক্ষা করা তত সহজ হবে। হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘চোখ ব্যভিচার করে। চোখের ব্যভিচার হচ্ছে দেখা’।[২]

কুদৃষ্টি ব্যভিচারের প্রথম সিঁড়ি : মনে রাখতে হবে কুদৃষ্টি হচ্ছে ব্যভিচারের প্রথম সিঁড়ি। কুদৃষ্টির মাধ্যমে বড় রকমের

* বিরল, দিনাজপুর।

১. পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে মুহাম্মদ (সাঃ), পৃ. ১২০।

২. ছহীহ বুখারী, হা/৬২৪৩; মুসনাদে আহমাদ, হা/৮৩৫৬।

অশ্লীলতার দ্বার খুলে যায়। কুদৃষ্টির পাপ বন্ধ করার জন্য কুরআন গাইডলাইন দিয়েছে।

মহান আল্লাহ মুমিন পুরুষ ও নারীদের আদেশ দিয়েছেন তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখে। তাদের কামনা যেন নিয়ন্ত্রণ করে। একবার যদি হঠাৎ করে চোখ পড়ে যায়, তবে যেন চোখ ফিরিয়ে নেয়। পুনরায় যেন না তাকায়। কারণ দ্বিতীয়বার দেখা হবে তার নিজের ইচ্ছায়। তাকে এক্ষেত্রে নির্দোষ বলা যাবে না।

মানুষ যদি তার দৃষ্টিকে চলার পথে সংযত করতে পারে, তাহলে তার আত্মিক পরিশুদ্ধির পথ উন্মোচিত হবে। হাদীছে প্রথমবারের অনিচ্ছাবশত দৃষ্টিকে ক্ষমা করা হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয়বার বা তৃতীয়বার দেখার পাপ ক্ষমা করা হয়নি।

কুদৃষ্টি সম্পর্কে চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণা : আধুনিক ফিরিঙ্গি সভ্যতার চিন্তাধারা হচ্ছে দেখলে কী ক্ষতি? শুধু তো দেখাই হলো। এতে দোষের কী আছে? প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে ,হঠাৎ যদি সামনে বাঘ এসে পড়ে এক নযর তার প্রতি তাকালে কেমন লাগবে? সবুজ গাছপালা, তরুলতা, সুন্দর ফুল একবার দেখেই কেমন মনে হয়? মন কি আনন্দে, শিহরণে ভরে যায় না? রক্তাক্ত আহত কোনো মানুষকে দেখামাত্র অনুভূতি কেমন হয়? মন কি বিপদে, দুঃখে পূর্ণ হয়ে যায় না? কেউ কেউ কিছু দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে বেহুঁশ হয়ে যায় না? কিন্তু কেন এমন হয়?

দৃষ্টি যেখানেই পতিত হয়, এর একটা ভালো বা মন্দ প্রভাব রয়েছে। সে প্রভাব মন-মগজে রেখাপাত করে। কামনার দৃষ্টিতে কারো প্রতি তাকালে হরমোনারি সিস্টেমে খারাপ কিছুই দেখা দেয়। কারণ সে দৃষ্টির প্রভাবে বিষ রয়েছে। এতে মানুষের দেহ অভ্যন্তরে তোলপাড় হয়ে যায়। ফলে নানা রোগের আক্রমণ ঘটে। অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে, মানুষ যদি তার দৃষ্টি সংযত না করে, তবে অবসাদ, অস্থিরতা এবং হতাশার শিকার হয়। এর চিকিৎসা অসম্ভব। কারণ দৃষ্টি মানুষের চিন্তা-চেতনা এবং আবেগকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়। এরকম বিপজ্জনক অবস্থা থেকে মানুষ ইসলামের শিক্ষা অনুসরণ করেই নিজেকে রক্ষা করতে পারে।

কুদৃষ্টির কারণে ইবাদতের মধ্যে কোনো স্বাদ পাওয়া যায় না : কুদৃষ্টির একটি ক্ষতি হচ্ছে, এতে ইবাদত-বন্দেগীর স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। ইবাদতের মধ্যে কোনো প্রকার স্বাদ পাওয়া যায় না।

কুদৃষ্টির পর চোখের নূর অবশিষ্ট থাকে না : কুদৃষ্টির একটি ক্ষতি হচ্ছে এ কুদৃষ্টির পর চোখে অন্ধকার ঘিরে থাকে, চোখের নূর অবশিষ্ট থাকে না। মনে অস্থিরতা ছেয়ে যায়। আর একটি ক্ষতি হচ্ছে, এ পাপ যত বেশি করা হয়, ততই করতে মন চায়। যারা কুদৃষ্টি দিয়ে থাকে তাদের প্রতি মহান আল্লাহর অভিশাপ। তারা মহান আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে যায়। হাদীছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'চোখের ব্যভিচার হচ্ছে দেখা, কানের ব্যভিচার হচ্ছে শোনা, জিহ্বার ব্যভিচার হচ্ছে কথা বলা, হাতের ব্যভিচার হচ্ছে স্পর্শ করা, পায়ের ব্যভিচার হচ্ছে হেঁটে যাওয়া, মনের ব্যভিচার হচ্ছে মনে মনে কাছে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা, তারপর লজ্জাস্থান সে ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করে অথবা সে ঘটনা মিথ্যা করে দেয়'।[৩]

কুদৃষ্টি ও আধুনিক বিজ্ঞান : মানুষের দৃষ্টিশক্তিকে সংযত রাখা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ 'আপনি মুমিনদের বলুন! তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে' *(আন-নূর, ২৪/৩০)*। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ 'নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় ওদের প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে' *(আল-ইসরা, ১৭/৩৬)*। জারীর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বর্ণনা করেন, হঠাৎ পড়ে যাওয়া দৃষ্টি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে আমি জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, 'তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবে'।[৪]

চোখ সম্পর্কে অজানা তথ্য : নিম্নে চোখ সম্পর্কে কিছু অজানা তথ্য দেওয়া হলো :

(১) পরিপূর্ণ একটি চোখের ওযন হয় ৭.৫ গ্রাম।
(২) একটি অক্ষিগোলকের ওযন হয় প্রায় ১ আউন্স।
(৩) চোখ খোলা রেখে মানুষ কখনোই হাঁচি দিতে পারে না।
(৪) মানুষের চোখ ১০ হাজারটি আলাদা আলাদা রং চিনতে পারে।
(৫) মানুষ গড়ে প্রতি ২ সেকেন্ড পরপর চোখের পলক ফেলে।
(৬) গড়ে প্রতিটি চোখের পলকের স্থায়িত্ব হয় ১ সেকেন্ডের ১০ ভাগের ১ ভাগ সময় পর্যন্ত।
(৭) মানুষ এক দিনে গড়ে ২০ হাজার বার চোখের পলক ফেলে।
(৮) পুরুষের চেয়ে মহিলারা প্রায় দ্বিগুণ চোখের পলক ফেলে।
(৯) শিশুরা প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের চেয়ে অনেক কম চোখের পলক ফেলে।
(১০) অক্ষিগোলকের শতকরা ৩ ভাগ জুড়েই রয়েছে লবণ।
(১১) মানুষের চোখ বা অক্ষিগোলকের ৬ ভাগের ৫ ভাগ থাকে ভেতরে, বাকি অংশ থাকে উন্মুক্ত।
(১২) আনন্দময় কোনো কিছু চোখে পড়লে আমাদের চোখের মণি ৪৫ শতাংশ পর্যন্ত প্রসারিত হয়।
(১৩) মানবদেহের সবচেয়ে সক্রিয় পেশিগুলোর অবস্থান চোখে।
(১৪) মানুষ খালি চোখে ১ মাইল দূর থেকে অন্ধকারে একটি জ্বলন্ত মোমবাতি দেখতে পায়।
(১৫) আমাদের প্রতিটি চোখে ১২ কোটি রড আছে।

---

৩. ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৫৭; আবূ দাঊদ, হা/২১৫৩।
৪. আবূ দাঊদ, হা/২১৪৮, হাদীছ ছহীহ।

কুরবানীর হাট : প্রাসঙ্গিক কিছু কথা, করণীয় ও বর্জনীয়

*-শেখ আহসান উদ্দীন**

আমরা ইসলাম ধর্মের অনুসারীরা তথা মুসলিম হিসেবে আমাদের প্রধান দু'টি উৎসব রয়েছে, ঈদুল ফিত্বর ও ঈদুল আযহা। ঈদুল ফিত্বর রামাযানের এক মাস ছিয়াম সাধনা শেষে শাওয়াল মাসের ১ তারিখে উদযাপিত হয়। আর ঈদুল আযহা যিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখে হয়। মূলত পশু কুরবানীর পটভূমিতেই এই ঈদুল আযহা উদযাপিত হয়। এই পশু কুরবানীর জন্য ইসলামে গরু, ছাগল, খাসি, পাঁঠা, ভেড়া, দুম্বা, উট, মহিষ ইত্যাদি জন্তু দিয়ে যবেহ ও কুরবানীর বিধান রয়েছে। তাই এই কুরবানীর পশু ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য বাংলাদেশ ও বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম দেশে এবং অমুসলিম দেশে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় কুরবানীর পশুর হাট আমরা দেখতে পাই। বাংলায় একে কুরবানীর হাট, উর্দূ ও হিন্দিতে কুরবানী মান্ডী, আরবীতে সূক্ব আল-আযাহী বলে।

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় কুরবানীর পশুর হাট দেখা যায়। ঢাকায় কুরবানীর পশুর হাটের ইতিহাস অনেক পুরনো। মোঘল ও ব্রিটিশ শাসনামলে ঢাকায় রহমতগঞ্জ, গাবতলীসহ পাঁচটি এলাকায় কুরবানীর পশুর হাট বসত। তখন লোকসংখ্যা কম ছিল। পরে ১৯৪৭ এর পরে পাকিস্তান আমলে ও ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আস্তে আস্তে কুরবানীর পশুর হাটের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এখন বর্তমানে ঢাকায় কুরবানীর পশুর হাটের সংখ্যা শতাধিক। ১৯৪৭ এর আগে পুরান ঢাকায় গেন্ডারিয়া, ধোলাইখাল, নয়াবাজার এসব এলাকায় কুরবানীর পশুর হাট ছিল না। পরে এসব এলাকায় কুরবানীর পশুর হাট বসেছে। ঢাকার বাইরে নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, কিশোরগঞ্জ, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, চাঁদপুর, সিলেট, রাজশাহী, বরিশাল, রংপুর ইত্যাদি জেলায় কুরবানীর পশুর হাটের অনেক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। একেক কুরবানীর হাটের কার্যক্রম ভিন্ন ভিন্ন দিনে শুরু হয়। অনেক হাট যিলহজ্জ মাসের চাঁদ উঠার দুই-তিন সপ্তাহ আগেই শুরু হয়, আবার অনেক হাট যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখার দুই-তিন দিন আগেই শুরু হয়। আবার অনেক হাট যিলহজ্জ মাসের প্রথম দিন থেকেই শুরু হয়। মধ্যরাতে বিভিন্ন জাতের দেশী, বিদেশী কুরবানীর পশু হাটে আসতে থাকে। তবে কুরবানীর হাটের ক্রেতাদের উপস্থিতিটা যিলহজ্জ মাসের প্রথম দিন থেকে শুরু হয়। যারা কুরবানীর হাটে গরু-ছাগল সরবরাহ করে বিক্রি করেন, তাদেরকে ব্যাপারী বলে। হাটে ক্রেতা সমাগম দেখা যায় ঈদুল আযহার চার/পাঁচ দিন আগে থেকে। কুরবানীর হাটের প্রচারণার জন্য ঈদের ১৫ দিন আগে থেকে মাইকিং ও পোস্টারিং শুরু হয়। 'হাট হাট হাট, এক বিরাট কুরবানীর হাট' এই বাক্যে প্রচারণা চলে। পাকিস্তান, ভারত, আফগানিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনেই, ইরান, ইরাক, সঊদী আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার, ওমান, বাহরাইন, লেবানন, ইয়ামান, জর্ডান, তুরস্ক, ফিলিস্তীন, সিরিয়া, মিশর, আলজেরিয়া, মরক্কো, আফ্রিকার বিভিন্ন মুসলিম দেশে কুরবানীর হাট দেখা যায়। বাংলাদেশের ঢাকায় গেন্ডারিয়া-ধোলাইখাল হাট, নয়াবাজার-রহমতগঞ্জ হাট, মতিঝিলের আরামবাগে উটের হাট, রাজারবাগে সুন্নতী জামে মসজিদ সংলগ্ন এলাকার হাট, মেরাদিয়া হাট, গাবতলী হাট, কেরানিগঞ্জ, হাজারীবাগ, ঠাটারিবাজার হাট ইত্যাদি হলো ঢাকার জনপ্রিয় কুরবানীর হাট।

প্রতিটি কুরবানীর পশুর হাটে বেচাকেনা জমজমাট হয়ে উঠে। গত ৬-৭ বছর আগে ই-কমার্স এর মাধ্যমে অনলাইনে কুরবানীর পশু ক্রয়েরও ব্যবস্থা হয়েছে। তবে কুরবানীর হাট সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগেরও শেষ নেই। কয়েকবছর আগে অনেক হাটে মাইকে লাউডস্পিকারে গানবাজনা ও মিউজিকসহ বিজ্ঞাপন বাজানোর অভিযোগ এসেছে। এগুলো খুবই দুঃখজনক। গত ২০১৬ সালে গেন্ডারিয়ার কুরবানীর হাটসহ কয়েকটা হাটে এভাবে ক্রেতাদের আকৃষ্ট করার জন্য মাইকে মিউজিকসহ গান বাজানোর অভিযোগ এসেছিল।[১] এখন প্রতি বছর প্রায় হাটে তা পরিলক্ষিত হয়। পাশাপাশি ঈদের আগে দিন যত ঘনিয়ে আসে ততই পশুর দাম বাড়তে থাকে। যা খুবই দুঃখজনক। উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে কুরবানীর হাটে মিউজিকসহ গান-বাজনা ও অসাধু পন্থা অবলম্বন করা অন্যায় এবং পবিত্রতা নষ্টের শামিল।

* সূত্রাপুর, ঢাকা।

১. বাংলা ট্রিবিউন।

কুরবানীর হাটে করণীয়, বর্জনীয় ও পরামর্শ :

(১) কুরবানীর হাটে ছালাতের স্থান রাখা উচিত।

(২) দেশের সকল কুরবানীর পশুর হাটে ক্রেতা আকর্ষণ বা এ জাতীয় অজুহাতে মাইকে বিজ্ঞাপন প্রচারের আড়ালে গান-বাজনা থেকেও বিরত থাকা উচিত।

(৩) তাক্বওয়ার জন্য মহিলাদের কুরবানীর পশুর হাটে যাওয়া থেকে বিরত থাকাই উত্তম।

(৪) চোর, ডাকাত, চাঁদাবাজ, অজ্ঞানপার্টি, মলমপার্টির প্রতিহত করার জন্য কুরবানীর পশুর হাটের সকল ইজারাদার ও বিক্রেতাদের সজাগ হওয়া উচিত।

(৫) অনলাইনে ওয়েবসাইটে কুরবানীর পশু ক্রয়সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন এবং এদের কর্মকর্তাদের নযরদারি রাখা উচিত।

(৬) কুরবানীর পশুর হাটে তাক্বওয়া রক্ষার্থে অযথা ছবি তোলা, ভিডিও রেকর্ড করা থেকে বিরত থাকা।

(৭) কুরবানীর পশুর হাট ও তৎসংশ্লিষ্ট এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে হাত ধোয়ার কলের ব্যবস্থা ও এটিএম বুথ বসানো।

(৮) প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন মিডিয়া তথা সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, নিউজপোর্টাল, ওয়েবসাইট ও ব্লগসাইটগুলোতে নযরদারি রাখা উচিত যেন কুরবানীর হাট, ঈদুল আযহা ও কুরবানী নিয়ে অযথা বিতর্ক সৃষ্টি বন্ধ হয়।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন- আমীন!

‘কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ঈমানের আলো ও মুনাফেক্বীর অন্ধকার’ প্রবন্ধটির বাকী অংশ

(২৭) মুমিনদের মুক্তি। ইউনুস আলাইহিস সালাম -এর ঘটনায় আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ ‘অতঃপর আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং দুশ্চিন্তা থেকে তাকে উদ্ধার করেছিলাম। আর এভাবেই আমি মুমিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি’ *(আল-আম্বিয়া, ২১/৮৮)*।

(২৮) মুমিনদের জন্য মহাপুরস্কার। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَسَوْفَ يُؤْتِ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ ‘আর অচিরেই আল্লাহ মুমিনদেরকে মহাপুরস্কার দান করবেন’ *(আন-নিসা, ৪/১৪৬)*।

(২৯) মুমিনদের জন্য আল্লাহর সাহচর্য। আর এটা হলো বিশেষ সাহচর্য। তা হচ্ছে- তাওফীক্ব, ইলাহী অনুপ্রেরণা ও শুদ্ধ করার সাহচর্য। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَأَنَّ اللهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ‘আর নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের সাথে আছেন’ *(আল-আনফাল, ৮/১৯)*।

(৩০) মুমিনগণ ভয় ও দুঃখ-চিন্তা থেকে নিরাপত্তায় থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ‘অতএব যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেকে সংশোধন করে নিয়েছে, তাদের নেই কোনো ভয় এবং তারা চিন্তিত হবে না’ *(আল-আনআম, ৬/৪৮)*।

(৩১) মহাপ্রতিদান। আল্লাহ তাআলা বলেন,﴿وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ ‘যে মুমিনগণ সৎআমল করে তাদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার’ *(আল-ইসরা, ১৭/৯)*।

(৩২) অশেষ প্রতিদান। আল্লাহ তাআলা বলেন,﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ ‘নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন প্রতিদান’ *(ফুছ্ছিলাত, ৪১/৮)*।

(৩৩) বস্তুত কুরআন মুমিনদের জন্য হেদায়াত ও রহমতস্বরূপ’ *(ইউনুস, ১০/৫৭)*। (শিফা) আরোগ্য ও রহমতস্বরূপ’ *(ফুছ্ছিলাত, ৪১/২৪)*।

(৩৪) ঈমানদারগণের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন,﴿لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ ‘তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট উচ্চ মর্যাদাসমূহ এবং ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক্ব’ *(আল-আনফাল, ৮/৪)*।

(চলবে)

প্যারেন্টিং কী, কেন এবং কীভাবে?

-মো. হাসিম আলী*

পিতা-মাতার জন্য সন্তান হচ্ছে স্রষ্টার বিরাট এক নেয়ামত। সন্তান পিতা-মাতার চক্ষুর শীতলতা, অন্তরের প্রশান্তি, জীবনের পরিপূর্ণতা এবং সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। সন্তানের সঠিক লালনপালনের জন্য তাদের জন্মের পর থেকে প্রতিষ্ঠা অবধি পিতা-মাতাকে একটি বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হয়, যার উপর নির্ভর করে সন্তানের সুষ্ঠু গঠন, সুস্থ জন্ম, সুন্দর বিকাশ, সত্যিকারের শিক্ষা এবং সুপ্রতিষ্ঠা।

প্যারেন্টিং পরিচিতি : Parenting ইংরেজি শব্দ। এর প্রতিশব্দ Child rearing। বাংলায় অর্থ সন্তান প্রতিপালন। পরিভাষায় প্যারেন্টিং হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে সন্তান জন্মের পর থেকে তার অগ্রগতির প্রতি সজাগ থাকা হয় এবং মানসিক, শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ইত্যাদি দিক দিয়ে তাকে সহযোগিতা করা হয়। এককথায়, সন্তান প্রতিপালনে পিতা-মাতার দায়িত্ব কর্তব্যই প্যারেন্টিং।

প্যারেন্টস পরিচিতি : জন্মদাতা পিতা-মাতা হলেন মূলত প্যারেন্টস। এছাড়া দাদা-দাদি, চাচা-চাচি, নানা-নানি, খালা-খালু, মামা-মামি, অন্যান্য আত্মীয়স্বজন, শিক্ষক, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংগঠন ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কো-প্যারেন্টস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

প্যারেন্টিং-এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা : প্যারেন্টিং একটি আমানতদারিতাপূর্ণ কাজ। এটি সন্তানের দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে, এটি সন্তানের অধিকার নিশ্চিত করে, এটি পিতা-মাতাকে দায়িত্ব সচেতন করে, এটি পিতা-মাতা ও সন্তান উভয়ের জন্যই একটি গাইডলাইন। এটি একটি দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগ। এটি সন্তানদের সঠিক আবেগ-অনুভূতি, তাদের মানসিক অথবা মনো-দৈহিক বিকাশের মূল চাবিকাঠি। এটি সন্তানের ইহ-পারলৌকিক জীবনে সফলতার পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপনা। এর উপর নির্ভর করে পিতা-মাতার মান-সম্মান, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সন্তানের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা; সর্বোপরি দেশ ও জাতির কল্যাণ। ভালো প্যারেন্টিংয়ের ফল হলো সুসন্তান, সুখী পরিবার, সুনাগরিক, সুস্থ সমাজ এবং সমৃদ্ধ রাষ্ট্র, সুশৃঙ্খল জাতি। আবার, প্যারেন্টিং ব্যর্থতার ফল হলো নৈতিক অবক্ষয়, সামাজিক অবক্ষয়, পাপাচার বৃদ্ধি, হতাশা, আদর্শহীনতা, চরিত্রহীন সন্তান, অশান্ত পরিবার, বিশৃঙ্খল রাষ্ট্র এবং বিপর্যস্ত বিশ্ব। সন্তানের সুষ্ঠু গঠন, বিকাশ ও প্রতিষ্ঠাকেনিশ্চিত করে পিতা-মাতার জীবনকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করতে ভালো প্যারেন্টিংয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

প্যারেন্টিংয়ের ধরন : প্যারেন্টিং শব্দটি উন্নত বিশ্বে এটি খুবই আলোচিত একটি পরিভাষা হলেও আমাদের দেশের অধিকাংশ পিতা-মাতাই এ বিষয়ে মোটামুটি অজ্ঞ। তারা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে তাদের বাবা-মা ও আত্মীয়দের অনুশীলন করা রীতি এবং নিজেদের সাধারণ বুদ্ধি বা কমন সেন্সের উপর যা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেকেলে, সময় অনুপযোগী, অবৈজ্ঞানিক এবং গবেষণাভিত্তিক নয়।

আমাদের কিছু প্যারেন্ট প্যারেন্টিং বলতে সন্তানের জন্য নামিদামি খাবারদাবারের ব্যবস্থা করা এবং তাদের নাদুসনুদুস স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা বুঝেন। কিছু প্যারেন্ট শুধু সন্তানের পড়ালেখা নিয়ে ব্যস্ত। তারা ভোর থেকে গভীর রাত অবধি সন্তানকে বিভিন্ন কোচিং ও প্রাইভেট টিউটরের পেছনে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ান। তারা সন্তানের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে মোটেই খেয়াল করেন না। কিছু প্যারেন্ট সন্তানের কোনো বিষয়েই খবর রাখেন না। কিন্তু পরীক্ষায় রেজাল্ট খারাপ হলেই শুরু করেন বকাবকি, মারধর, ভাত বন্ধ করে দেওয়ার হুমকিসহ নানা শাস্তি। কিছু প্যারেন্ট সন্তানকে নামিদামি স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েই নিজেকে দায়মুক্ত মনে করেন। এরপর তারা শুধু সন্তানের চাহিদামতো টাকার জোগানই দেন। এ টাকা কোথায় ব্যয় হয় তারা কিছুই জানেন না। কিছু প্যারেন্ট প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত সন্তানের পেছনে ছায়ার মতো লেগে থাকেন; কিন্তু এরপর তাদের আর কোনো খোঁজ রাখেন না।

কিছু প্যারেন্ট শুধু নিজের রুজি-রুটি, ব্যবসা-বাণিজ্য আর রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত। সন্তানের কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তা করার সুযোগ তার নেই। তাদের ধারণা বাড়ি-গাড়ি সবই আছে, এগুলো দেখভাল করলেই সন্তানের জীবন অনায়াসে পার হয়ে যাবে। কিছু প্যারেন্ট শুধু সন্তানের বৈষয়িক উন্নতি-অবনতির দিকে নজর রাখেন। তাদের চারিত্রিক শুদ্ধাচার ও পারলৌকিক সফলতা নিয়ে কিছুই ভাবেন না। কিছু প্যারেন্ট শুধু সন্তানের চারিত্রিক শুদ্ধাচার ও পারলৌকিক সফলতা নিয়েই চিন্তা করেন; পার্থিব উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা নিয়ে কোনো চিন্তা করেন না। এ জাতীয় চিন্তার কারণে প্রকারান্তরে তারা নিজেরাই যে ধর্মীয় বিধান লঙ্ঘন করছেন, সে দিকেও তাদের খেয়াল নেই। কিছু প্যারেন্ট সন্তানকে যমের মতো ভয় করেন। সন্তানের কথায় ওঠা-বসা করেন। সন্তানের উপর তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। সে কারণে খুব সহজেই পিতা-মাতাকে যিম্মী করে নামিদামি

* সহকারী শিক্ষক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া।

মোবাইল, ক্যামেরা, ট্যাব, মোটরসাইকেলের সাথে ওয়াইফাই সংযোগ এবং হাজার হাজার নগদ টাকা বাগিয়ে নিচ্ছে সন্তানরা। আসলে উপরিউক্ত প্যারেন্টদের কোনো সিদ্ধান্তই সঠিক নয়। আবার সংখ্যায় কম হলেও কিছু প্যারেন্ট তাদের সন্তানের সুষ্ঠু গঠন, বিকাশ ও প্রতিষ্ঠাকে গুরুত্ব দেন। তারা সন্তানের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে খুবই যত্নবান। এরা সন্তানের সকল প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখার পাশাপাশি স্নেহের শাসনও করেন। তারা সন্তানকে মন-প্রাণ উজার করে ভালোবাসেন; কিন্তু কোনো অন্যায় কর্ম ও আবদারকে প্রশ্রয় দেন না। এরাই যথার্থ প্যারেন্টস।

প্যারেন্টিং চ্যালেঞ্জ এবং আমাদের সমাজ-সংস্কৃতি : পরিবার শিশুর প্রথম বিদ্যালয়। সন্তান সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে বেশি শিক্ষালাভ করে তার পরিবার থেকে। সে পিতা-মাতা, দাদি-দাদা, চাচা-ফুফু এদের আচরণের ভালো-মন্দ দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়। তাদের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই তার দৃষ্টিভঙ্গি গঠিত হয়। সুতরাং পরিবার থেকেই সততা-নৈতিকতার প্রশিক্ষণ শুরু করতে হবে। পরিবার যদি কলহ-বিবাদ, অনৈক্যতার বিষবাষ্পে ভরা থাকে, সে পরিবারে সন্তানের বেড়ে ওঠা, বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা সবই বাধাগ্রস্ত হয়।

পরিবারের পরই শিশু সমাজ থেকে শিক্ষা পায়। সমাজের মানুষের আচরণের ভালো-মন্দ দ্বারাও সে প্রভাবিত হয়। তাদের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে তারও দৃষ্টিভঙ্গি গঠিত হয়। সুতরাং সমাজে একটি শিশুর সুষ্ঠুভাবে বেড়ে ওঠার উপাদানগুলো অবশ্যই বিদ্যমান থাকতে হবে। কোনো সমাজের পিতা-মাতা, অভিভাবক বা দায়িত্বশীল ব্যক্তি যদি নিজে ধূমপান, মদপান, জুয়া, ধর্ষণ, ব্যভিচার, গুম, খুন, চুরি, লুটতরাজ, ডাকাতি, অশ্লীলতা ইত্যাদি অপকর্মের সাথে জড়িত থাকেন আর তাদের সন্তান বা অধীনস্তরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তাহলে প্রকৃত দোষী কে? সন্তান না অভিভাবক?

সন্তান লালনপালনের প্রধান দায়িত্ব পিতা-মাতা পালন করলেও সমাজ ও রাষ্ট্র তার সুষ্ঠু প্রতিপালনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কথায় আছে, ‘প্রজারা রাজার চরিত্রে চরিত্রবান হয়’। রাজা অর্থাৎ দায়িত্বশীলরা ভালো তো প্রজা বা নাগরিকরা ভালো। সর্বোচ্চ ৫০০ জন দায়িত্বশীল ব্যক্তিই দেশের চেহারা পরিবর্তন করে দিতে পারেন। যার সবচেয়ে বড় প্রমাণ ইতিহাসের অক্ষয় ধ্রুবতারা, সর্বযুগের, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, তাঁর খলীফাবৃন্দ, তাঁদের অনুসারীবৃন্দ। উমার ইবনু আব্দিল আযীয রাহিমাহুল্লাহ তো মাত্র দুই বছরের শাসনামলে তৎকালীন পুরো মুসলিম বিশ্বে এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিলেন যে, যাকাত নেওয়ার মতো গরীব লোক সে সমাজে খুঁজে পাওয়া যেত না। আর ন্যায়বিচার, শান্তি ও নিরাপত্তাও ছিল প্রশ্নাতীত। কিন্তু নিষ্ঠুর বাস্তবতা হচ্ছে, আমাদের পরিবার নীতি-নৈতিকতার চর্চা প্রায় শূন্যের কোঠায়। পরিবার ও সমাজব্যবস্থা ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে। সর্বত্র অনৈতিকতার সয়লাব এবং নৈতিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। সততা, ন্যায়পরায়ণতা, দায়িত্বশীলতা, আমানতদারিতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, শালীনতাবোধ, জবাবদিহিতার সোনার চেয়ার আজ দখল করে আছে মিথ্যাচার, গলাবাজি, বিচারহীনতা, দায়িত্বহীনতা, তছরুপ ও যুলুম, অশ্লীলতা, খেয়ানত, অযোগ্যতা আর অদক্ষতা। ন্যায়বোধ আজ নির্বাসনে। মানুষের খুন আজ নুনের চেয়ে সস্তা। রান্নাঘর থেকে সংসদ সর্বত্র নৈতিকতা আজ প্রশ্নবিদ্ধ। এককভাবে কোনো শ্রেণি-পেশার মানুষ আজ সম্মানের দাবি করতে পারছেন না। এরকম অরাজক পরিবেশে অনাগত ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে প্যারেন্টিং কতটা চ্যালেঞ্জিং তা অবশ্যই ভাবনার দাবি রাখে।

সফল প্যারেন্টিং-এর উপায় : পিতা-মাতাকে শুধু ভালো, সৎ, চরিত্রবান সন্তান আশা করে বসে থাকলে চলে না, এজন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সাথে সাথে বিজ্ঞানসম্মত সতর্ক পদক্ষেপ নিতে হয়। সফল প্যারেন্টিং-এর ক্ষেত্রে পিতা-মাতাকে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্বারোপ করা উচিত:

(১) আদর্শিক মডেল উপস্থাপন করতে হবে। কারণ তারাই সন্তানের সবচেয়ে বড় প্রভাবক। মনে রাখতে হবে, তেঁতুল গাছে কখনো আঙুর ফল ধরে না।

(২) উপার্জনে পবিত্রতা রক্ষা করতে হবে। কারণ হারাম ও অবৈধ অর্থে লালিত সন্তান কখনো আদর্শ মানুষ হতে পারে না।

(৩) উন্নত মূল্যবোধ ও নৈতিকতা যেমন— ধৈর্য, সততা, আমানতদারিতা, ন্যায়পরায়ণতা, ক্ষমা, উদারতা, পরার্থপরতা, আত্মসংযম, পরমতসহিষ্ণুতা ইত্যাদি সদগুণ লালন করতে হবে।

(৪) বৈবাহিক ও দাম্পত্য জীবনে পবিত্রতা রক্ষা করতে হবে।

(৫) বিয়ে, সন্তান জন্মদান ও লালনপালনের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

(৬) বিবাদ ও কলহমুক্ত সুখী দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করতে হবে।

(৭) ইতিবাচক ও উন্নত দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হতে হবে।

(৮) একান্ত ব্যক্তিগত কর্ম ও বিষয়াদির ব্যাপারে কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে।

(৯) সন্তানের শিক্ষকদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

(১০) নিজের পিতা-মাতা ও আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে। মাঝে মাঝে আত্মীয়দের বাসায় সন্তানদের বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে।

(১১) পরিবারে লৌকিকতামুক্ত ইসলাম শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ ধর্মহীন মানুষ পশুর চেয়ে নিকৃষ্ট।

(১২) কথায় ও কাজে দেশপ্রেম প্রমাণ করতে হবে। দেশবিরোধী কোনো কাজে যুক্ত থাকা যাবে না।
(১৩) সামাজিক কাজে ও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে হবে। এতে থিউরি শিক্ষাদানের পাশাপাশি প্রাকটিক্যালও হয়ে যাবে।
(১৪) সমসাময়িক বিশ্ব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখতে হবে।
(১৫) নিজেদের জীবনের অপূর্ণ স্বপ্ন বা ইচ্ছা সন্তানের মাধ্যমে বাস্তবায়নের চেষ্টা থেকে বিরত থাকতে হবে। তাই একক নয়; সবার সিদ্ধান্তে ভিশন গঠন করতে হবে।
(১৬) প্যারেন্টিং-সংশ্লিষ্ট বই-পুস্তক সংগ্রহ ও এ বিষয়ে পড়াশোনা করতে হবে। প্রয়োজনে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে।
(১৭) আত্মসম্মানবোধ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হতে হবে।
(১৮) অপরিকল্পিত ও অপরিণামদর্শী ঋণগ্রহণ পরিহার করতে হবে। এগুলো সন্তানের মানসিক গঠনকে বাধাগ্রস্ত করে।
(১৯) বাসায় লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।
(২০) বিশুদ্ধরূপে মাতৃভাষায় কথা বলতে হবে এবং সন্তানকে শুদ্ধভাবে মাতৃভাষায় কথা বলতে শেখাতে হবে।
(২১) মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সন্তানকে ভর্তি করাতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সুনামের পাশাপাশি এর মূল্যবোধ, শৃঙ্খলাবোধ, কারিকুলাম, প্রশাসনিক অবস্থা, শিক্ষকের মান, তাদের আচরণ, নৈতিকতাবোধ, যোগ্যতা ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।
(২২) সন্তানের শিক্ষকদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষার পাশাপাশি প্যারেন্টস মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করতে হবে।
(২৩) সন্তানের চলাফেরা, বন্ধুবান্ধব, বাসায় অবস্থান ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। সন্ধ্যার পর সন্তান যাতে বাসার বাইরে না থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে।
(২৪) উন্মুক্ত পারিবারিক লাইব্রেরির ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে সন্তানেরা তাদের ইচ্ছামতো বই সেখান থেকে নিয়ে পড়তে পারে। মনে রাখতে হবে, ‘লাইব্রেরি হলো মনের হাসপাতাল’। তবে ধর্ম ও রাষ্ট্রবিরোধী কোনো লেখকের বই লাইব্রেরিতে রাখবেন না।
(২৫) সন্তানের বন্ধু তৈরির ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে। মাঝে মাঝে তাদের বন্ধুর বাসায় পরিবারসহ আসা-যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
(২৬) মিডিয়া ও প্রযুক্তি ব্যবহার সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। সবাই মিলে দেখা যায় না এমন কিছু দেখা বা সার্চ করা যাবে না।
(২৭) প্রয়োজনে ইউটিউব থেকে ভালো ভালো শিক্ষণীয় জিনিস ডাউনলোড করে রাখতে হবে। পরে সময় সুযোগমতো সেগুলো দেখানো যেতে পারে। সপ্তাহে একদিন ইসলামিক প্রামাণ্যচিত্র দেখানোর ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। পরে সেটির শিক্ষণীয় বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে হবে।
(২৮) সন্তানের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ ও ব্যক্তিত্ব তৈরি করতে হবে। তার পোশাক ও চুলের কাটিং-এর প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে।
(২৯) কারো কাছে কোনো কিছু চাইতে বা ঋণ করতে সন্তানকে পাঠানো থেকে বিরত থাকতে হবে।
(৩০) সন্তান সম্পর্কে কোনো খারাপ মন্তব্য বা সমালোচনা থেকে বিরত থাকতে হবে।
(৩১) কোনো ডিভাইস যেমন টিভি, মোবাইল, ট্যাব ইত্যাদি এবং কোনো ব্যক্তিকে পিতা-মাতার বিকল্প ভাবা থেকে বিরত থাকতে হবে।
(৩২) সন্তানের অন্তত এইচএসসি/আলিম পাশের আগে তাকে পারসোনাল এনড্রয়েড ফোন অথবা মোটরসাইকেল কেনা থেকে বিরত থাকতে হবে।
(৩৩) সন্তানকে ছোট, নির্বোধ বা অবুঝ ভাবা থেকে বিরত থাকতে হবে।
(৩৪) কোনো ভুলের কারণে বকা দেওয়া বা প্রহার করা, অতিরিক্ত শাসন করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
(৩৫) সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে। বুঝাতে হবে যে, সকল সংস্কৃতিই সুস্থ নয়।
(৩৬) পারসোনাল হাইজিন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে হবে।
(৩৭) মানসিক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।
(৩৮) বাসায় সাপ্তাহিক চা-চক্র/পাঠচক্রের আয়োজন করতে হবে।
(৩৯) পরিবারের উপার্জন সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে। অতিরিক্ত নগদ অর্থ তার হাতে দেওয়া উচিত নয়।
(৪০) সন্তানের খরচের খাত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে।
(৪১) সন্তানের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে হবে।
(৪২) শত ব্যস্ততার মাঝেও সন্তানকে পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, পিতা-মাতার আসল কাজ বা দায়িত্ব শুরুই হয় তাদের বাসায় ফেরার পর।
(৪৩) কৌশলে হলেও সন্তানের মনের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। আপনি উত্তর না দিলে সে অন্যজনকে আপনার চেয়ে জ্ঞানী ও আপনজন ভাববে।
(৪৪) ভার্চুয়াল প্লে-গ্রাউন্ডের পরিবর্তে খেলার মাঠের প্রতি সন্তানকে আগ্রহী করতে হবে।
(৪৫) ভালোবাসা, আদর আর কাউন্সিলিংয়ের সাথে সাথে স্নেহমিশ্রিত শাসনও করতে হবে।

মোটকথা, সন্তানের প্রতিটি পদক্ষেপ সজাগভাবে পর্যবেক্ষণ এবং তার সবরকম উন্নতির জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করাই প্যারেন্টিং। সুখী-সমৃদ্ধ পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এবং বিশ্ব গঠনের মাধ্যমে ইহ ও পরকালীন সফলতা নিশ্চিত করতে প্যারেন্টিং শিক্ষার বিকল্প নেই। এ ক্ষেত্রে সন্তানের প্রভাবক তিনটি অঙ্গ— পিতা-মাতা, সমাজ ও রাষ্ট্রকে একযোগে কাজ করতে হবে। সফল প্যারেন্টস হিসেবে মহান স্রষ্টা আমাদের সবাইকে কবুল করুন- আমীন!

ঈদুল আযহা : করণীয় ও বর্জনীয়

*-আবূ লাবীবা মুহাম্মাদ মাকছূদ**

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ', শক্তির উদ্‌বোধন।
দুর্বল! ভীরু! চুপ রহো, ওহো খাম্‌খা ক্ষুব্ধ মন!
ধ্বনি ওঠে রণি দূর বাণীর,–
আজিকার এ খুন কোর্‌বানির!

কুরবানীর সূচনাকাল অতি প্রাচীন। আমাদের আদি পিতা আদম (আলাইহিস সালাম)-এর যুগ থেকেই কুরবানীর প্রচলন। আদম (আলাইহিস সালাম)-এর দুই পুত্র হাবীল ও কাবীল। কাবীল হাবীলের চেয়ে বয়সে বড়। একদা উভয়েই আল্লাহ তাআলার জন্য কুরবানী করেছিল। কিন্তু কী জন্য করেছিল তার বর্ণনায় বিশুদ্ধভাবে কিছু পাওয়া যায় না। ইমাম ইবনু কাছীর (রহিমাহুল্লাহ) তার তাফসীরে এ সম্পর্কে কয়েকটি বর্ণনা নিয়ে এসেছেন, যেগুলো বিশুদ্ধ নয়। তাই বলা যায়, তখন কুরবানীর বিধান ছিল ও একদা তারা উভয়ে কুরবানী করেছিল। কাবীলের কুরবানী কবুল না হওয়ায় হাবীলের সাথে হিংসা করে সে তাকে হত্যা করে। তবে একথা প্রসিদ্ধ যে, দুনিয়ার প্রাথমিক অবস্থায় আদম ও হাওয়া (আলাইহিমাস সালাম)-এর একটি ছেলে ও একটি মেয়ে একসাথে জন্মগ্রহণ করত। পরবর্তী গর্ভে অনুরূপ একটি ছেলে ও একটি মেয়ে জন্মগ্রহণ করত। তখন পূর্ব গর্ভের ছেলে-মেয়ের সাথে পরবর্তী গর্ভের ছেলে-মেয়ের বিবাহ দেওয়া হতো। হাবীলের যমজ বোন সুন্দরী ছিল না। কিন্তু কাবীলের যমজ বোন সুন্দরী ছিল। তৎকালীন শরীআত অনুযায়ী হাবীলের বিবাহ কাবীলের যমজ বোনের সাথে আর কাবীলের বিবাহ হাবীলের যমজ বোনের সাথে হবার কথা। কিন্তু কাবীল তা মানতে অস্বীকৃতি জানাল।

আদম (আলাইহিস সালাম) কাবীলকে বুঝালেন। কিন্তু সে বুঝতে চেষ্টা করল না। অবশেষে আদম (আলাইহিস সালাম) উভয়কে আল্লাহ তাআলার নামে কুরবানী পেশ করার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, যার কুরবানী কবুল হবে, কাবীলের যমজ বোনকে তার সাথে বিবাহ দেওয়া হবে। হাবীল ছিল মেষপালক, ফলে হাবীল একটি মোটাতাজা মেষ কুরবানীর জন্য পেশ করল। আর কাবীল ছিল কৃষক, সে কিছু গমের শীষ কুরবানীর জন্য পেশ করল। আসমান থেকে আগুন এসে হাবীলের কুরবানী জ্বালিয়ে দিল, যা কবুল হবার নিদর্শন। কাবীলের কুরবানী গ্রহণ করা হলো না। ফলে হিংসায় সে হাবীলকে হত্যা করার মনস্থ করল। তবে উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে তারা কুরবানী করেছিল বলে এর কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না।[১]

মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَاناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنْ الْمُتَّقِينَ﴾ 'আদমের দুই পুত্রের (হাবীল ও কাবীলের) বৃত্তান্ত তুমি তাদেরকে যথাযথভাবে শোনাও, যখন তারা উভয়ে কুরবানী করেছিল, তখন একজনের কুরবানী কবুল হলো এবং অন্যজনের কুরবানী কবুল হলো না। (তাদের একজন) বলল, আমি তোমাকে অবশ্যই হত্যা করব। (অপরজন) বলল, আল্লাহ তো সংযমীদের কুরবানীই কবুল করে থাকেন' *(আল-মায়েদাহ, ৫/২৭)*। এভাবে কুরবানীর প্রচলন প্রত্যেক জাতির মধ্যেই ছিল। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرْ الْمُخْبِتِينَ﴾ 'আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কুরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি; যাতে আমি তাদেরকে জীবনোপকরণস্বরূপ যেসব চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছি, সেগুলোর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য। সুতরাং তোমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণ করো। আর সুসংবাদ দাও বিনীতগণকে' *(আল-হজ্জ, ২২/৩৪)*।

ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর কুরবানীর আদর্শ হওয়ার ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ- فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ- وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ- قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ- إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ- وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ – وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ 'অতঃপর যখন সে তার সাথে চলাফেরা করার বয়সে পৌঁছল, তখন সে বলল, হে প্রিয় বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে যবেহ করছি। অতএব দেখো তোমার কী অভিমত? সে বলল, হে আমার পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, আপনি তাই করুন। আমাকে ইনশা-আল্লাহ আপনি অবশ্যই ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন। অতঃপর তারা উভয়ে যখন আত্মসমর্পণ করল এবং সে তাকে (ইসমাঈলকে) কাত করে শুইয়ে দিল, তখন আমি তাকে আহ্বান করে বললাম, হে ইবরাহীম! তুমি তো স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করে দেখালে। আমি এভাবেই সৎকর্মশীলদের

* শিক্ষক, মাদরাসা ইশাআতুল ইসলাম আস-সালাফিয়্যাহ, রাণীবাজার, রাজশাহী।

১. তাফসীর ইবনু কাছীর ও ফাতহুল মাজীদ, আল-মায়েদাহ, ৫/২৭-এর তাফসীরের আলোকে।

প্রতিদান দিয়ে থাকি। নিশ্চয় এটা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আর আমি তার পরিবর্তে যবেহ করার জন্য এক মহান জন্তু দিয়ে তাকে মুক্ত করে নিলাম। আর তার জন্য এ বিষয়টি পরবর্তীদের জন্য স্মরণীয় করে রাখলাম' *(আছ-ছাফফাত, ৩৭/১০২-১০৮)*।

উল্লেখ্য, স্বপ্ন দেখে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম -এর তিন দিন সকালে উট কুরবানী করার কথা বিশুদ্ধ নয়।

ইসলামী শরীআতে যিলহজ্জের ১০ তারিখ মুসলিম উম্মাহর জন্য পবিত্র ঈদের দিন। এ দিনের কয়েকটি নাম হলো—

(১) يَوْمُ النَّحْرِ (২) يَوْمُ الْأُضْحِيَّةِ (৩) يَوْمُ عِيْدِ الْأَضْحَى (৪) يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ

يَوْمُ النَّحْرِ এর يَوْمُ অর্থ দিন এবং النَّحْرِ অর্থ কুরবানী দেওয়া। অর্থাৎ يَوْمُ النَّحْرِ অর্থ কুরবানীর দিন। যেহেতু এ দিনে মহান আল্লাহর নির্দেশে কুরবানী করা হয়ে থাকে, তাই একে يَوْمُ النَّحْرِ বলা হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা কুরআনে النَّحْرِ শব্দ প্রয়োগে কুরবানীর নির্দেশ দিয়ে বলেন, - ﴿إِنَّآ أَعْطَيْنَٰكَ ٱلْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ﴾ 'নিশ্চয় আমি আপনাকে আল-কাউছার দান করেছি। অতএব, আপনার রবের উদ্দেশ্যেই ছালাত আদায় করুন এবং নহর (কুরবানী) করুন' *(আল-কাউছার, ১০৮/১-২)*।

এ দিনের অপর কয়েকটি নামের প্রথম নামটি হলো, يَوْمُ الْأُضْحِيَّةِ উযহিয়্যাহ (اَلْأُضْحِيَّةِ) শব্দ দ্বারা কুরবানীর পশুকে বুঝানো হয়।

এ দিনের অপর নাম হলো, يَوْمُ عِيْدِ الْأَضْحَى যার মধ্যে الْأَضْحَى অর্থ পূর্বাহ্ন। যেহেতু এ দিনে কুরবানীর পশুটিকে পূর্বাহ্নে যবেহ করা হয় বা প্রত্যুষে ঈদের ছালাত আদায় করা হয়, তাই এ দিনকে বলা হয়, يَوْمُ عِيْدِ الْأَضْحَى।

এ দিনের অপর নাম হলো, يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ। হাজীগণ এ দিনে ১টি ফরয এবং ৪টি ওয়াজিব মিলিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মোট পাঁচটি কাজ করার মধ্য দিয়ে হজ্জ সম্পাদন করে থাকেন বিধায় এ দিনকে يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ বলা হয়। যেমন ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ فَقَالَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا يَوْمُ النَّحْرِ قَالَ هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ 'রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ আদায়কালে নহরের দিন জামরাতের মধ্যবর্তী স্থলে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'এটি কোন দিন? লোকেরা বললেন, আজ কুরবানীর দিন। তিনি বললেন, 'আজ বড় হজ্জের দিন'।[২]

এ দিনের গুরুত্ব বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, إِنَّ أَعْظَمَ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ 'প্রাচুর্যময় মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন দিন হলো কুরবানীর দিন, তারপর মেহমানদারীর দিন, সেটি হলো দ্বিতীয় দিন'।[৩]

ঈদুল আযহায় আমাদের গুরুত্বপূর্ণ করণীয় :

(১) যিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখ অর্থাৎ ঈদুল আযহার দিন এবং তার পরবর্তী আইয়ামুত তাশরীকের তিন দিন যথাক্রমে ১১, ১২ ও ১৩ তারিখের দিনগুলোতে আমাদের প্রথম করণীয় হলো, 'বেশি বেশি তাকবীর দেওয়া এবং আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার যিকর করা'। যিলহজ্জ মাসের চাঁদ উদিত হওয়ার পর থেকে ১৩ তারিখের সূর্যাস্তের আগমুহূর্ত পর্যন্ত দুটি নিয়মে তাকবীর পাঠ করার সুন্নাহ আমল ছহীহ সুন্নাহতে পাওয়া যায়। ফিক্বহের পরিভাষায় সেগুলোকে (ক) আত-তাকবীর আল-মুত্বলাক্ব (اَلتَّكْبِيْرُ الْمُطْلَقُ) এবং (খ) আত-তাকবীর আল-মুক্বায়্যাদ (اَلتَّكْبِيْرُ الْمُقَيَّدُ) বলা হয়।

(ক) আত-তাকবীর আল-মুত্বলাক্ব (اَلتَّكْبِيْرُ الْمُطْلَقُ) : যিলহজ্জ মাসের চাঁদ উদিত হওয়ার পর থেকে ১৩ তারিখের সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাকবীর পাঠের নির্দেশ ছহীহ সুন্নাহতে রয়েছে, যাকে আত-তাকবীর আল-মুত্বলাক্ব বলা হয়। এ সময়ের মধ্যে পঠিত তাকবীরগুলো কোনো সুনির্ধারিত সময়, স্থান, সংখ্যা বা শর্ত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। অর্থাৎ তাকবীরগুলো সাধারণভাবে এ সময়সীমার মধ্যে যেকোনো সময়েই পাঠ করা সুন্নাত।

(খ) আত-তাকবীর আল-মুক্বায়্যাদ (اَلتَّكْبِيْرُ الْمُقَيَّدُ) : যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ ফজরের পর থেকে ঈদুল আযহা এবং তার পরবর্তী আইয়ামুত তাশরীকের তিন দিন যথাক্রমে ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রতি ওয়াক্তের ফরয ছালাত শেষে একাকী ও সশব্দে তাকবীর পাঠ করা সুন্নাত, যাকে ফিক্বহের পরিভাষায় আত-তাকবীর আল-মুক্বায়্যাদ বলা হয়। আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে বলেন, ﴿وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْدُودَٰتٍ﴾ 'আর স্মরণ করো আল্লাহকে নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনে' *(আল-বাক্বারা, ২/২০৩)*। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, وَالْأَيَّامُ الْمَعْدُوْدَاتُ: أَيَّامُ التَّشْرِيْقِ 'নির্দিষ্ট দিনগুলো বলতে আইয়ামুত-তাশরীককে বুঝানো হয়েছে'।[৪]

আত-তাকবীর আল-মুত্বলাক্ব (اَلتَّكْبِيْرُ الْمُطْلَقُ), আত-তাকবীর আল-মুক্বায়্যাদ (اَلتَّكْبِيْرُ الْمُقَيَّدُ) উভয় নিয়মে এ মর্মে ছহীহ

২. আবূ দাঊদ, হা/১৯৪৫, হাদীছ ছহীহ।

৩. আবূ দাঊদ, হা/১৭৬৫, হাদীছ ছহীহ।

৪. ছহীহ বুখারী, ৪/১২২।

সুন্নাহতে বর্ণিত তাকবীরগুলো হলো—

(ক) اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، وَلِلهِ الْحَمْدُ অর্থাৎ 'আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই। আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য'।[৫]

(খ) اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ। অর্থাৎ 'আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই। আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য'।[৬]

(গ) اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً অর্থাৎ 'আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, বড়। সব প্রশংসা আল্লাহর। আর সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁরই পবিত্রতা বর্ণনা করতে হবে'।[৭]

(ঘ) سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ অর্থাৎ 'আমরা আল্লাহ তাআলার প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, মহান আল্লাহ অতীব পবিত্র'।[৮]

আইয়ামুত তাশরীকের দিনগুলোতে ভালো খাবার গ্রহণের এবং ঈদের আনন্দ ও উৎসবের দিন, পাশাপাশি এ দিনগুলোতে বেশি বেশি আল্লাহর যিকরেরও দিন। মানুষের শারীরিক বিকাশের জন্য যেমন আনন্দ-উৎসব এবং ভালো খাবারের প্রয়োজন হয়, তেমনি আত্মিক উন্নয়নের জন্যও প্রয়োজন হয় অধিক পরিমাণে আল্লাহর স্মরণ তথা যিকর। যদি কেবল আল্লাহ তাআলার স্মরণ ভুলে অনবরত খাদ্য গ্রহণ এবং আনন্দ-উৎসবে মেতে থাকা হয়, তবে ব্যক্তিজীবনে আত্মিক উৎকর্ষতার পরিবর্তে আত্মিক সংকীর্ণতা নেমে আসে, ফলে যমীনে পাপাচার বেড়ে যায়। এজন্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল আযহা পরবর্তী আইয়ামুত তাশরীকের দিনগুলোতে অধিক পরিমাণে মহান আল্লাহর স্মরণের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেন, أَلَا وَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ 'জেনে রেখো, এ দিনগুলো পানাহারের দিন এবং মহান আল্লাহকে স্মরণ করার দিন'।[৯]

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আজ সমাজের অধিকাংশ মানুষ আইয়ামুত তাশরীকের দিনগুলোতে অধিক বা মজাদার খাবার গ্রহণ, আনন্দ-উৎসব করা, আত্মীয়স্বজনের বাড়ি বেড়াতে যাওয়া এবং কোথাও ঘুরতে যাওয়ার মতো বিভিন্ন আনন্দ ও বিনোদনমূলক কাজে এমনভাবে লিপ্ত হয়ে পড়েন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ সুন্নাতকে হৃদয়ঙ্গম করে এ দিনগুলোতে যিকির-আযকার করা তো দূরের কথা, বরং তারা নিয়মিত ছালাতের জামাআতে হাযির হতেও ব্যর্থ হন। আগে নিয়মিত জামাআতে যতটা ছালাত আদায় করতেন, এ দিনগুলোতে ততটা তারা আর করেন না এবং পুরো সমাজেই গান-বাজনা, অশ্লীল নৃত্য, বিভিন্ন স্পটে ছবি তোলা, অশ্লীল ও বাজে সঙ্গ গ্রহণ করাসহ মহান আল্লাহর নানাবিধ নাফরমানীমূলক কাজে জড়িত হয়ে পড়েন। সারা বছরের এই অবসর দিনগুলো আত্মীয়স্বজনসহ বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের কাছে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরার এবং মহান আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের এক মোক্ষম সুযোগ, যা আমরা সহজেই হাতছাড়া করি। আল্লাহ আমাদেরকে বিষয়গুলো উপলব্ধি করার এবং সুন্নাহর প্রতি যত্নশীল হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন।

(২) ঈদের দিনের আরেকটি সুন্নাত হলো, পায়ে হেঁটে ঈদের ছালাতে উপস্থিত হওয়া (اَلذَّهَابُ إِلَى مُصَلَّى الْعِيْدِ مَاشِيًا إِنْ تَيَسَّرَ)। তাই যথাসম্ভব যানবাহন এড়িয়ে পায়ে হেঁটে ঈদগাহে রওনা দেওয়া উচিত, তবে কোনো ওযর থাকলে ভিন্ন কথা।[১০]

(৩) ঈদগাহে পৌঁছানোর পুরো সময় জুড়ে মহান আল্লাহর তাকবীর ঘোষণা করা সুন্নাত।[১১] সম্ভব হলে এক রাস্তা দিয়ে ঈদের ছালাতে উপস্থিত হয়ে আরেক রাস্তা দিয়ে ফিরে আসা উচিত, যা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্যতম আরেকটি সুন্নাত।[১২]

(৪) ঈদের ছালাত মাঠে আদায় করা উত্তম। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববী যেখানে এক রাকআত ছালাত আদায় করা অন্য যেকোনো মসজিদের তুলনায় ১০০০ গুণ উত্তম,[১৩] তা রেখে ঈদের ছালাত মাঠে আদায় করেছেন, এজন্য উলামায়ে কেরামও এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, ঈদের ছালাত ঈদগাহে আদায় করা উত্তম।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ঈদের ছালাত যদি কোনো কারণে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, তবে ছালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে প্রবেশের পর বসার পূর্বেই দুই রাকআত সুন্নাত ছালাত তথা 'তাহিয়্যাতুল মাসজিদ' আদায় করতে হবে।[১৪] এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত, যা প্রতিবার মসজিদে প্রবেশের পর বসার পূর্বেই আদায় করতে হয়। আর যদি ঈদের ছালাত ঈদগাহে অনুষ্ঠিত হয়, তবে ঈদের ছালাত অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে ক্বাযা

---

৫. ইরওয়াউল গালীল, ৩/১২৫।
৬. প্রাগুক্ত।
৭. ছহীহ মুসলিম, হা/৬০১।
৮. ছহীহ বুখারী, হা/৬৬৮২।
৯. আবূ দাঊদ, হা/২৮১৩, হাদীছ ছহীহ।
১০. ইরওয়াউল গালীল, ৩/১২৫-১২৬; মিরআত, হা/১৪৬৭-এর ব্যাখ্যা, ৫/৭০।
১১. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, হা/৫৬২৯, ৫৬৬৫, সনদ ছহীহ; ইরওয়াউল গালীল, ৩/১২১।
১২. ছহীহ বুখারী, হা/৯৮৬; মিশকাত, হা/১৪৩৪।
১৩. ইবনু মাজাহ, হা/১৪০৬, হাদীছ ছহীহ।
১৪. ছহীহ মুসলিম, হা/৭১৪; ইবনু মাজাহ, হা/১০১২।

ছালাত ব্যতীত অন্য কোনো ছালাত আদায় করা যাবে না।[১৫]

(৫) ঈদের ছালাত আদায়ের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাত। ঈদুল আযহার দিনের ফজর ছালাতের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কেননা ঈদুল আযহার দিন যেমন শ্রেষ্ঠতম দিন তেমনি এর ফজরও শ্রেষ্ঠতম। উপরন্তু এ দিনের ফজরের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা শপথ করেছেন। তিনি বলেন, ﴿وَالْفَجْرِ - وَلَيَالٍ عَشْرٍ - وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾ 'শপথ ফজরের, শপথ ১০ রাতের, শপথ জোড় ও বেজোড়ের' *(আল-ফজর, ৮৯/১-৩)*।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় একাধিক মত পাওয়া যায়। তবে মাসরূক, মুজাহিদ ও মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব রাহিমাহুমুল্লাহ এ আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যায় বলেন, الْمُرَادُ بِهِ فَجْرُ يَوْمِ النَّحْرِ خَاصَّةً، وَهُوَ خَاتِمَةُ اللَّيَالِي الْعَشْرِ অর্থাৎ এর দ্বারা বিশেষভাবে ঈদুল আযহার সকালবেলাকে বুঝানো হয়েছে। আর ওটা হলো ১০ রাত্রির সমাপ্তি।[১৬]

সুতরাং যারা ঈদুল আযহার দিন ফজর আদায় করেননি, তাদের উপর কর্তব্য হলো ফরযের প্রতি গুরুত্বারোপ করে আগে ফজর আদায় করে নেওয়া। অতঃপর ঈদের ছালাত আদায় করা। কেননা মহান আল্লাহর ফরয বিধান লঙ্ঘন করে সুন্নাত ছালাত আদায় করার কোনো অর্থই নেই।

(৬) ঈদের দিনের আরেকটি সুন্নাত হলো, মুসলিমদের সাথে ঈদের ছালাতে অংশ নেওয়া এবং খুৎবা শোনা।[১৭] ঈদের ছালাত সুন্নাত না ওয়াজিব, এ বিষয়ে আহলুল ইলমের মাঝে মতভেদ রয়েছে। তাদের মধ্যে কারো কারো মতে, এটি সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। তবে শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ-সহ অপরাপর ইমামগণের মতে, ঈদুল আযহার ছালাত আদায় করা ওয়াজিব। তাদের দলীল হলো, ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ 'কাজেই আপনি আপনার রবের উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় করুন এবং কুরবানী করুন' *(আল-কাউছার, ১০৮/২)*। এই দলীলের আলোকে এ মতটিই বেশি শক্তিশালী। অতএব, কুরবানীর আগে অবশ্যই ছালাত আদায় করতে হবে। এটি পবিত্র কুরআনুল কারীমের একটি নির্দেশ। আর ছালাত আদায় শেষে খুৎবা শুনাটাও একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত।

(৭) ঈদের দিনের আরও সুন্নাত হলো, التَّهْنِئَةُ بِالْعِيدِ অর্থাৎ 'একে অপরের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করা'। শুভেচ্ছা বিনিময়ের ক্ষেত্রে সুন্নাত হলো একে অপরের সাথে সাক্ষাতের প্রারম্ভে এই দু'আ করা, تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ অর্থাৎ 'মহান আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের নেক আমলগুলো কবুল করে নিন'।[১৮] অথবা تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ অর্থাৎ 'আমাদের আমল ও আপনার আমল কবুল করে নিন'।[১৯] শু'বা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, لَقِيَنِي يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَقَالَ: تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ অর্থাৎ 'আমি ইউনুস ইবনু উবাইদ-এর সাথে ঈদের দিনে সাক্ষাৎ করেছি অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ।[২০]

এভাবে স্বাগত জানানো ভালো। তবে ঈদ মোবারক (عِيدٌ مُبَارَكٌ) বা এ ধরনের কোনো ভালো অর্থপূর্ণ শব্দ দিয়েও স্বাগত জানানোর ব্যাপারে প্রশস্ততা রয়েছে।

(৮) ঈদুল আযহার দিনের একটি উত্তম আমল হলো, কুরবানীর পশু মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহর নামে যবেহ করা (ذَبْحُ الْأُضْحِيَّةِ)। নিজের কুরবানীর পশু নিজেই যবেহ করা উত্তম।[২১] যবেহের সময় নিজের বা অন্যের পক্ষ থেকে একনিষ্ঠভাবে একমাত্র মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে এই দু'আ পড়ে কুরবানী দিতে হবে, بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ অর্থাৎ 'আল্লাহর নামে শুরু করছি; আল্লাহই মহান'।[২২]

যবেহের সময় উক্ত দু'আটি পাঠ করা ওয়াজিব। এটি ইচ্ছাকৃতভাবে পাঠ না করে কোনো যবেহ করলে, মহান আল্লাহর নিকট তা কবুল হবে না। যবেহর ক্ষেত্রে পাঠ করা যায়, এমন আরো কিছু মাসনূন দু'আ রয়েছে, তবে এক্ষেত্রে একমাত্র মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে অন্তরের একনিষ্ঠ নিয়্যত এবং উল্লিখিত দু'আটিই যথেষ্ট। কুরবানীর পশু যে কেউ যবেহ করতে পারেন। এমনকি হিজাব রক্ষা করে যদি কোনো মহিলা যবেহ করেন, তবে তাতেও কোনো অসুবিধা নেই।[২৩] অন্যদের ডেকে তাদের দিয়ে কুরবানী করানোর নিয়ম রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন ও সালাফে ছালেহীন রাহিমাহুমুল্লাহ-এর যুগে প্রচলন ছিল না। এটা উচিতও নয়। তাঁরা কুরবানীতে এমন বিশেষ কোনো দু'আ পাঠ করতেন না, যা যে কারো পক্ষে পাঠ করা সম্ভব নয়, উপরন্তু মনের ভেতরের সকল প্রকার সংকীর্ণতা ও ভয় ঝেড়ে ফেলে একটি সুন্নাত ও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত মনে করে একমাত্র মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাক্বওয়ার সাথে ও একনিষ্ঠ নিয়্যতে নিজের পশু নিজেই কুরবানী করার গুরুত্ব অপরিসীম। এতে উপর্যুক্ত দু'আগুলো ব্যতীত বিশেষ কোনো দু'আ পাঠেরও অপরিহার্যতা নেই। কেননা আল্লাহ তাআলা ভালো করেই জানেন যিনি কুরবানী

---

১৫. ছহীহ মুসলিম, হা/৮৮৪; আবূ দাঊদ, হা/১১৫৯।
১৬. তাফসীর ইবনু কাছীর, ৮/৩৯০।
১৭. ছহীহ মুসলিম, হা/৮৮৫; মুসনাদে দারেমী, হা/১৬৫১।
১৮. সুনানুল বায়হাক্বী, হা/৬০৯১, ৩/৩১৯।
১৯. আল-মু'জামুল কাবীর, হা/১২৩, ২২/৫২; ফাতহুল বারী, ২/৪৪৬।
২০. ত্বাবারানী, আদ-দু'আ, হা/৯২৯।
২১. ছহীহ বুখারী, হা/৫৫৬৫; ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৬৬।
২২. ছহীহ বুখারী, হা/৫৫৬৫; ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৬৬; মিশকাত, হা/১৪৫৩।
২৩. ছহীহ বুখারী, হা/৫৫০৫; মুসনাদে আহমাদ, হা/৪৫৯৮।

দিচ্ছেন তার মনের অবস্থা, তার কুরবানীর উদ্দেশ্য, কুরবানীর পশু হালাল অর্থে না হারাম অর্থে ক্রয়কৃত, লোক দেখানোর উদ্দেশ্য না মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ইত্যাদি।

কুরবানী ঈদুল আযহার দিনসহ আইয়ামে তাশরীকের শেষ দিন পর্যন্ত মোট চার দিন করা যায়। তবে প্রথম দিনেই কুরবানী করে নেওয়া উত্তম।[২৪]

(৯) আশেপাশে কোথাও দুর্ভিক্ষ না থাকলে কুরবানীর গোশত তিন দিনের বেশি জমিয়ে রেখে খাওয়া যায়। তবে দুর্ভিক্ষ থাকলে তিন দিনের বেশি জমিয়ে রাখা যাবে না, বরং তা দরিদ্রদের মাঝে বিলিয়ে দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জীবনের শেষ ১০টি বছর কুরবানী করেছেন। তন্মধ্যে একটি বছর দুর্ভিক্ষ থাকায় কুরবানীর পশু যবেহর পর তিন দিনের অধিক জমা করে রাখতে নিষেধ করেছিলেন। যাতে করে নিজে খেয়ে দুর্ভিক্ষকবলিতদের মাঝে অতিরিক্ত গোশত বিলিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু যখন দুর্ভিক্ষ চলে গেল, তখন তিনি এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন এবং কুরবানীর গোশত ভক্ষণ করা, জমা করা এবং দান করার ব্যাপারে ব্যক্তি স্বাধীনতা দিয়ে দেন। এ প্রসঙ্গে নুবাইশাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِنَّا كُنَّا نَهَيْنَاكُمْ عَنْ لُحُومِهَا أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ لِكَيْ تَسَعَكُمْ فَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالسَّعَةِ فَكُلُوا وَادَّخِرُوْا وَاتَّجِرُوْا أَلَا وَإِنَّ هٰذِهِ الْأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ‘আমরা তোমাদেরকে তিন দিনের অধিক কুরবানীর গোশত খেতে নিষেধ করেছিলাম, যাতে গোশত তোমাদের সকলের নিকট পৌঁছে যায়। মহান আল্লাহ এখন তোমাদের দারিদ্র্য মোচন করেছেন। কাজেই এখন তোমরা তা খাও, জমা করে রাখো এবং ছাদাক্বা করে নেকী অর্জন করো। জেনে রেখো, এ দিনগুলো পানাহারের দিন এবং মহান আল্লাহকে স্মরণ করার দিন’।[২৫]

সুতরাং এ হাদীছের আলোকে এখনো যদি কোনো এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় বা দরিদ্রতা বহুলাংশে বেড়ে যায়, তবে সেখানে এর বিধান প্রযোজ্য হবে। তখন তিন দিনের মধ্যে খেয়ে ফেলতে হবে, না হয় অন্যদের দিয়ে দিতে হবে।

ঈদুল আযহার দিনের ভুলত্রুটি :

(১) আমাদের সমাজে ঈদুল আযহার দিনের ভুলত্রুটি অনেক, তন্মধ্যে অপব্যয় এবং অনর্থক ব্যয় করা অন্যতম (الْإِسْرَافُ وَالتَّبْذِيْرُ)।

(২) এদিনের আরেকটি ভুল হলো একজনের নেতৃত্বে জামাআতবদ্ধ হয়ে তাকবীর বলা (التَّكْبِيْرُ الْجَمَاعِيُّ)। অনেকে হজ্জে গিয়ে তালবিয়া পাঠ করার সময়ও জামাআতবদ্ধ হয়ে এ কাজ করেন। এটি একটি সুস্পষ্ট বিদআত। বরং সুন্নাত হলো একাকী ও সশব্দে নিজের তাকবীর নিজেই বলা।

(৩) এদিনের আরেকটি ভুল হলো, হিজাবের বিধান লঙ্ঘন করে নারী-পুরুষে একাকার হয়ে যাওয়া اِخْتِلَاطُ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ। মনে হয় যেন এ দিনে পর্দা শিথিল করা হয়েছে, যা সঠিক নয়। বছরের শ্রেষ্ঠ দিন হিসেবে এ দিনে প্রতিটি ইবাদত মহান আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়, তেমনি এ দিনে মহান আল্লাহর বিধান লঙ্ঘনও তদ্রূপ কঠিন ও গুরুতর গুনাহের কাজ।

(৪) এদিনের আরো ভুলত্রুটি ও গুনাহের কাজ হলো গান শোনা (سِمَاعُ الْغِنَاءِ) এবং বৈধ কোনো প্রয়োজন ব্যতিরেকে অহেতুক ছবি তোলা।

(৫) এদিনের আরো ভুলত্রুটি ও গুনাহের কাজ হলো সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী না করা। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উম্মাহকে এ বিষয়ে সচেতন করে বলেন, مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا ‘যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করে না, সে যেন আমাদের ঈদের মাঠের কাছেও না আসে’।[২৬]

(৬) ঈদের দিনে নির্দিষ্ট দু‘আগুলোর মাধ্যমে শুভেচ্ছা বিনিময় করাকে তাহনিয়াহ (التَّهْنِئَةُ) বলে। আমাদের দেশে অনেকেই ঈদের দিনে তাহনিয়াহ এর পরিবর্তে ঈদের দিনকে কেন্দ্র করে মুআনাকা (কোলাকুলি) করেন। এমনকি অনেকে দীর্ঘদিন পর ঈদের ছুটিতে বাড়িতে ফিরলেও মুআনাকা না করে ঈদের দিনের জন্য তা জমিয়ে রাখেন। মুআনাকা ঈদের দিনের কোনো সুন্নাত আমল নয়। বরং মুআনাকা এমন একটি সুন্নাত আমল, যা দীর্ঘদিন পর কোনো পরিচিত ব্যক্তির সাথে প্রথম সাক্ষাতে করা হয়ে থাকে। প্রতিনিয়ত কারো সাথে দেখা-সাক্ষাতে মুআনাকা করা বা কেবল ঈদের দিন মুআনাকা করা সুন্নাহসম্মত নয়। তবে ঈদের দিনে কারো সাথে দীর্ঘদিন পর দেখা হলে মুআনাকা করা যাবে।

(৭) অনেকেই ঈদের ছুটিতে বাড়িতে গেলে বাবা-মায়ের কবর যিয়ারত না করে তা কেবল ঈদের দিনের জন্য রেখে দেন। এটাও সুন্নাহসম্মত নয়। বাবা-মায়ের কবর যিয়ারত যেকোনো দিনে করা যায় এবং যত বেশি করা যায় তত ভালো। এর সাথে ঈদের দিনগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই।

হে দয়াময় আল্লাহ! আমাদের কুরবানীর গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ অনুযায়ী কুরবানী করা, ইয়াউমুন নাহার ও আইয়ামুত তাশরীকের আমলগুলো করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

২৪. মুসনাদে আহমাদ, হা/২২৯৮৪।
২৫. আবূ দাঊদ, হা/২৮১৩, হাদীছ ছহীহ।
২৬. ইবনু মাজাহ, হা/৩১২৩, হাসান।

মুমিনগণ মৌমাছির মতো

-মেরাজুল ইসলাম*

মৌমাছি, মৌমাছি
কোথা যাও নাচি নাচি
দাঁড়াও না একবার ভাই।
ওই ফুল ফোটে বনে
যাই মধু আহরণে
দাঁড়াবার সময় তো নাই...!

আরবীতে ক্রিয়ার (فعل) মতো নির্দেশসূচক (امر) শব্দের ক্ষেত্রেও পুরুষ ও স্ত্রীবাচক উভয়ই বিদ্যমান। যেমন: আরবীতে একজন পুরুষকে (المفرد) খাবার খেতে নির্দেশ দিতে হলে বলতে হবে كُلْ মানে হলো 'খাও'। কিন্তু স্ত্রীবাচকে (مؤنث) সেটা হবে كُلِي। একইভাবে পথ চলার নির্দেশ দানের ক্ষেত্রে স্ত্রীবাচক শব্দ হলো أُسْلُكِي মানে হলো 'গমণ করো'। সাথে আরও আছে اِتَّخِذِيْ মানে হলো 'গ্রহণ করো'। আলোচিত নারীবাচক এই শব্দগুলোই ব্যবহৃত হয়েছে পবিত্র কুরআনের নিম্নবর্ণিত আয়াত দু'টিতে। লক্ষ করুন- আল্লাহর বাণী,

﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ - ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

'আপনার রাব্ব মৌমাছির অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছেন, তুমি গৃহ নির্মাণ করো পাহাড়, বৃক্ষ এবং মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে। এরপর প্রত্যেক ফল হতে কিছু কিছু আহার করো, অতঃপর তোমার রবের সহজ পথ অনুসরণ করো। ওর উদর হতে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয়, যাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিষেধক। অবশ্যই এতে রয়েছে নিদর্শন চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য' *(আন-নাহল, ১৬/৬৮-৬৯)*।

প্রথম কথা হলো, এখানে 'অহী' মানে নবীদের কাছে আগত অহীর মতো কোনো ব্যাপার নয়। বরং এর মানে হলো ইলহাম বা ইঙ্গিত করা অথবা বলতে পারেন অন্তরে জাগিয়ে দেওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ইবনু কাছীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, اَلْمُرَادُ بِالْوَحْيِ هُنَا الإِلْهَامُ وَالْهِدَايَةُ وَالْإِرْشَادُ لِلنَّحْلِ অর্থাৎ 'এখানে অহী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মৌমাছির প্রতি ইলহাম, পথ-প্রদর্শন এবং নির্দেশনা'।[১]

মজার বিষয় হলো, দার্শনিক শেক্সপিয়রের লিখিত henry iv নাটকে দেখানো হয়েছে তাদের রাজ্য পরিচালনা করে একজন পুরুষ এবং কর্মী মৌমাছিদেরও সকলেই পুরুষ।[২] সেই ধারণাকে ভেঙ্গে দিয়ে karl von frisch[৩] ১৯৭৩ সালে প্রমাণ করে দেখান, মৌমাছিদের রাজ্য পরিচালনার দায়ভার মূলত রাণী মৌমাছির, এমনকি কর্মী মৌমাছিদের ব্যাপারেও তিনি বলছেন, They are females but do not lay eggs. অর্থাৎ 'তারা স্ত্রী মৌমাছি, তবে ডিম পাড়ে না'।[৪] কেবল তাই নয়, তিনি আরও বলেন, In short, they perform all the duties with which the queen and the drones (male bee) do not concern themselves. অর্থাৎ 'সোজা কথায়, এই কর্মী মৌমাছিগুলো এমন কর্মও যোগান দেয়, যে কাজে তাদের নিযুক্ত করা হয়নি'।[৫]

বলুন তো, কে তাকে এই ব্যাপারগুলো বুঝিয়ে দিল?

এর উত্তর রয়েছে পবিত্র কুরআনে ﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ﴾ 'আর আপনার রব অহী করলেন মৌমাছির নিকট' অংশের মধ্যে। অর্থাৎ তাকে শিক্ষা দেন আপনার আমার এবং এই মহাবিশ্বের একমাত্র রব মহান আল্লাহ তাআলা।

কথা এখানেই শেষ নয়, গৃহ নির্মাণ, তাকে বসবাস উপযোগী করে তোলা, পরিচ্ছন্নতা ও রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি কাজে তারা Architect-এর ভূমিকায় কাজ করে। karl von frisch এর মত অনুযায়ী, act as Architects of the bee residence.[৬]

---

১. ইবনু কাসীর, ৪/৪৯৯।

২.https://academic.oup.com/isle/article/23/4/835/2740728.

৩.একজন অষ্ট্রিয়ান প্রাণিবিদ।

বিস্তারিত: https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Karl_von_Frisch.

৪. Karl von Frisch, The dancing bee, p. 3.

৫. Karl von Frisch, The dancing bee, p. 3.

৬. Karl von Frisch, The dancing bee, p. 3.

---

* যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।

গমনরত বিভিন্ন পথে তারা এক ধরনের সংকেত-ধ্বনির আদানপ্রদানের মাধ্যমে খাদ্যের অনুসন্ধান করে, যার নাম দেওয়া হয়েছে waggle dance.[৭] তারা কেবল অনুসন্ধানই করে না বরং বাছাইও করে। Christop Ghuter এবং walter M. Farina এর একটি যৌথ রিসার্চে বলা হচ্ছে, The honeybee (Apis mellifera) waggle dance, whereby dancing bees communicate the location of profitable food sources to other bees in the hive, is one of the most celebrated communication behaviours in the animal world.[৮]

সোজা কথায় মৌমাছিরা খাদ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে কেবল সেই সোর্সগুলোই বাছাই করে, যা উপকারী। এমনকি তাদের পেট থেকেও নির্গত হয় উপাদেয় ও উপকারী পানীয়, যা মধু নামে পরিচিত। পবিত্র কুরআনের ভাষায়, ﴿يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾ 'ওর উদর হতে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয়, যাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিষেধক'।

মধুর এই উপকারিতা আজ সর্বজন স্বীকৃত একটি বিষয়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ، 'রোগমুক্তি আছে তিনটি জিনিসে। শিঙ্গা লাগানোতে, মধু পানে এবং আগুন দিয়ে দাগ দেওয়াতে। আমার উম্মাতকে আগুন দিয়ে দাগ দিতে নিষেধ করছি'।[৯]

মৌমাছিদের এই কাজগুলো হঠাৎ বনে যাওয়া কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। বরং এর পেছনে রয়েছে এক মহাপবিত্র, মহান জ্ঞানী, সুমহান রব মহান আল্লাহ তাআলার অপার জ্ঞানের পরিচয়। যা উক্ত আয়াতে উল্লেখিত -اتخذي، كلي - فاسلكي শব্দত্রয়ের মাঝে যথাযথভাবে ফুটেছে। আর এই শব্দত্রয় আরো ইঙ্গিত বহন করে যে, নির্দেশগুলো দেওয়া হয়েছে 'স্ত্রী' মৌমাছিকে। যার স্বীকারোক্তি karl von frish এর নিজস্ব উক্তিতেই রয়েছে, They are females but do not lay eggs. অর্থাৎ 'তারা স্ত্রী মৌমাছি, তবে ডিম পাড়ে না'।[১০] অতএব, ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ 'হে মানুষ! কীসে তোমাকে তোমার মহান রব সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল?' *(আল-ইনফিত্বার, ৮২/৬)*।

মুমিনকে তুলনা করা যেতে পারে এই মৌমাছির সাথে। যে তার রবের command-কে দায়িত্বশীলতার সাথে পালন করে, তার চেতনার পুরোটা জুড়ে থাকে কেবলই তার রবের প্রতি আত্মসমর্পণ, সে কখনও তার রবকে ভুলে যায় না। সে যখন খায়, তখন পবিত্র বস্তু খায় আর যখন দান করে তখন পবিত্র বস্তু দান করে।

কথাগুলো মূলত আমার নিজের নয়। বরং বিশ্ব মানবতার মহান মুক্তিদূত বিগত সাড়ে ১৪০০ বছর আগে ঈমানদার বান্দাগণকে এভাবেই পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ النَّحْلَةِ لَا تَأْكُلُ إِلَّا طَيِّبًا وَلَا تَضَعُ إِلَّا طَيِّبًا 'মুমিনগণ মৌমাছির মতো। সে পবিত্র বস্তু ছাড়া আহার করে না এবং পবিত্র বস্তু ছাড়া দান করে না'।[১১] অন্য বর্ণনায় আছে, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ لَكَمَثَلِ النَّحْلَةِ، أَكَلَتْ طَيِّبًا، وَوَضَعَتْ طَيِّبًا، وَوَقَعَتْ فَلَمْ تُكْسَرْ وَلَمْ تَفْسُدْ 'যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, তাঁর শপথ! নিশ্চয়ই মুমিনগণ মৌমাছির মতো। সে পবিত্র বস্তু খায় এবং পবিত্র বস্তু দান করে। সে ওয়াদা ভঙ্গ করে না, ফাসাদ সৃষ্টি করে না'।[১২]

তবে সকলেই এখান থেকে শিক্ষা নেবে না। কেবল তারাই নেবে, যাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন, ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ 'নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে সেই সকল লোকের জন্য, যারা চিন্তাভাবনা করে' *(আন-নাহল, ১৬/৬৯)*।

প্রশ্ন হলো, কারা সেই চিন্তাভাবনাকারী?

ইমাম ত্বাবারী রাহিমাহুল্লাহ-এর ভাষায়, তারা হলো সেই সমস্ত লোক, যারা এই সকল নিদর্শন দেখে বুঝতে পারে যে, أَنَّهُ الْوَاحِدُ الَّذِيْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، وَأَنَّهُ لَا يَنْبَغِيْ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ شَرِيْكٌ، وَلَا تَصِحُّ الْأُلُوْهِيَّةُ إِلَّا لَهُ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ একক, তাঁর মতো কোনো কিছুই নেই। এটা উচিত হবে না যে, আমরা তাঁর সাথে শিরক করব। আর এটাও ঠিক হবে না যে, তার উলূহিয়্যাহ তথা ইবাদতকে তিনি ছাড়া অন্য কারও জন্য নির্ধারণ করব'।[১৩]

৭. Karl von Frisch, The dancing bee, p. 177.
৮. https://www.researchgate.net/publication/24220378.
৯. ছহীহ বুখারী, হা/৫৬৮১।
১০. Karl von Frisch, The dancing bee, p. 3.
১১. ছহীহ ইবনে হিব্বান, হা/২৪৭, হাসান।
১২. মুসনাদে আহমাদ, হা/৬৮৭২, সনদ ছহীহ।
১৩. তাফসীরে তাবারী, ১৭/২৫০।

কবি নজরুল ও তাঁর ইসলামী চিন্তাধারা

-মো. আকরাম হোসেন*

যুগে যুগে পৃথিবীতে এমন কিছু কীর্তিমান পুরুষের আবির্ভাব ঘটে, যারা পৃথিবীকে আলোকিত করেন তাঁদের জ্ঞানের ফোয়ারা দিয়ে। অল্প সময়ের জন্য তাঁরা পৃথিবীতে আসেন, এমন এক সম্পর্কের বন্ধন রেখে চলে যান, অনন্তকাল ধরে বেঁচে থাকেন পৃথিবীর মানুষের মধ্যে। এমন একজন কীর্তিমান ব্যক্তি ছিলেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। যাঁর সৃষ্টি ছিল সার্বজনীন সামগ্রিকতায় পূর্ণ। যাঁর সৃষ্টি থেকে জ্ঞানপিপাসুরা পেয়েছে তাদের মনের খোরাক, মুসলিমরা পেয়েছে তাদের চেতনার সামগ্রী। তাঁর শিশু সাহিত্য পড়ে শিশুরা ভেবেছে তিনি তাদের একজন; অসহায় ও দঃখী মানুষ ভেবেছে তিনি তাদেরই মতো কোনো দুঃখীজন। যুবকেরা তাঁর লেখায় পেয়েছে যৌবনের গান, বিদ্রোহীরা পেয়েছে সাহসের যোগান।

কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন একজন মুসলিম বিদ্রোহী কবি। তাঁর অনেক কবিতায়, প্রবন্ধে মুসলিমদের নিমিত্তে লিখিছেন এবং নিজেকে মুসলিম কবি হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। যদিও তার কিছু লেখনী ও ব্যক্তিগত জীবন ছিল বিতর্কিত ও সমালোচিত। তবে এখানে শুধু তাঁর কিছু ইসলামী রচনা ও ইসলামপ্রেমের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হবে।

১৯২২ সালে যখন নজরুল ইসলাম ‘নবযুগ’ পত্রিকার চাকরি ছেড়ে দিয়ে দেওঘরে চলে যান, দেওঘর স্টেশনে নামার পর একটি মজার ঘটনার মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি। একদল পাণ্ডা এসে ধরে বসল তাঁকে। নিয়ে যাবে তাদের আখড়ায়। কিছুতেই যখন ছুটতে পারছিলেন না, তখন নজরুল ইসলাম বললেন, আমি তো মুসলমান, তোমরা আমাকে নিয়ে যেতে চাও কেন? নজরুলের কথা শুনেও পাণ্ডারা বিশ্বাস করল না। পাণ্ডাদের একজন বলল, না বাবু, আপনি ঝুট বাত বলতেয়াছেন, আপনি ঠিক হিন্দু লোক আছেন। নজরুল কিছুটা বিরক্তির সুরে বললেন, আরে কী মুশকিল, আমি হিন্দু হতে যাব কোন দুঃখে? আমার নাম কাজী নজরুল ইসলাম। আমি মুসলমান, আমার বাপ মুসলমান, আমার দাদা মুসলমান, আমার চৌদ্দ পুরুষ মুসলমান। এবার বলো, এরপরও কি তোমরা আমাকে তোমাদের আখড়ায় নিয়ে যেতে চাও? এবার হতাশ হলো পাণ্ডারা, বিশ্বাস করল নজরুলের কথা। একজন মুসলমানকে আখড়ায় নিয়ে যাওয়ার আগ্রহ তাদের নেই। পাণ্ডাদের কাছ থেকে ছাড় পেয়ে নজরুল তাঁর গন্তব্যে পৌঁছলেন।

নজরুল ইসলাম আমাদের শিখিয়ে গেছেন পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে আপন স্বাতন্ত্র্যে ঝলসে উঠতে। এই স্বাতন্ত্র্য তাঁর নিজের মধ্যেও ছিল। তাঁর লেখার মাঝেই ফুটে উঠেছে তাঁর সেই পরিচয়। নিজের পরিচয় সম্পর্কে তিনি কোনো অস্পষ্টতা রেখে যাননি। তিনি বলেন,

‘আল্লাহ আমার প্রভু,
আমার নাহি নাহি ভয়।
আমার নবী মোহাম্মাদ,
যাঁহার তারিফ জগৎময়।
আমার কিসের শঙ্কা,
কুরআন আমার ডঙ্কা,
ইসলাম আমার ধর্ম,
মুসলিম আমার পরিচয়।’
(সংক্ষিপ্ত)

এই কবিতায় দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে তিনি নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করেছেন। কেবল কবিতা আর গানে নয়, ‘আমার লীগ কংগ্রেস’ প্রবন্ধে তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, ‘আল্লাহ আমার প্রভু, রাসূলের আমি উম্মত, আল-কুরআন আমার পথ প্রদর্শক’। মহান আল্লাহর প্রতি কবির ঈমানকে আরও জোরালোভাবে স্পষ্ট করেছেন। তার ‘মোবারকবাদ’ কবিতায়-

‘আল্লাহ ছাড়া কারও কাছে কভু শির করিয়ো না নিচু,
এক আল্লাহ কাহারও বান্দা হবে না, বলো।’

ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে তিনি বলেছেন, ‘ইসলাম ধর্ম এসেছে পৃথিবীতে পূর্ণ শান্তি, সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে’। এ শান্তি ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালানো একজন

* শিক্ষক, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

মুসলিমের মৌলিক দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনের জন্যই যে তিনি কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, সেকথাও তিনি অকপটে ব্যক্ত করেছেন তাঁর বিভিন্ন কবিতায়, গানে এমনকি প্রবন্ধ ও অভিভাষণে। তিনি তাঁর জাতীয় পরিচয় দিয়েছেন এভাবে-

‘ধর্মের পথে শহীদ যারা
আমরা সেই সে জাতি
সাম্য মৈত্রী এনেছি আমরা
বিশ্বে করেছি জ্ঞাতি।’

তিনি মহাগ্রন্থ আল-কুরআন গভীরভাবে অনুধাবনের চেষ্টা করেন; সাথে তাঁর মনে ছিল জিহাদী জাযবা। তিনি এক অভিভাষণে বলেন, ‘আল্লাহর সৃষ্টি এই পৃথিবী আজ অসুন্দর, নির্যাতনে, বিদ্বেষে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। মানুষ আল্লাহর খলীফা অর্থৎ প্রতিনিধি-ভাইসরয়। মানুষ আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এই পৃথিবীর রাজরাজেশ্বর একমাত্র আল্লাহ। যারা এই পৃথিবীতে নিজেদের রাজত্বের দাবি করে তারা শয়তান। সে শয়তানের সংহার করে, আমরা আল্লাহর রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করব’।

ঘুণেধরা মুসলিমসমাজকে তাদের অতীত ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করার নিমিত্তে তরুণ-যুবসমাজকে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে নজরুল লিখেছেন,

‘বাজিছে দামামা, বাঁধো রে আমামা
শির উঁচু করি মুসলমান।
দাওত এসেছে নয়া জমানার
ভাঙা কিল্লায় ওড়ে নিশান॥
মুখেতে কলমা হাতে তলোয়ার,
বুকে ইসলামি জোশ দুর্বার,
হৃদয়ে লইয়া এশ্‌ক্ আল্লার
চল আগে চল বাজে বিষাণ।’

কবি নজরুল ভীরু-কাপুরুষ হয়ে পড়া মুসলিম জাতির মাঝে সাহসের সঞ্চার করার জন্য একটি গানের মধ্যে বলেন,

‘উঠুক তুফান পাপ-দরিয়ায়-
আমি কি তায় ভয় করি
পাক্কা ঈমান-তক্তা দিয়ে
গড়া যে আমার তরী॥
দাঁড় এ তরীর নামাজ, রোজা, হজ্ব ও জাকাত,
উঠুক না মেঘ, আসুক বিপদ-যত বজ্রপাত,
আমি যাব বেহশত-বন্দরেতে রে
এই যে কিশতীতে চড়ি॥’

মুসলিমদের পুনর্জাগরণের জন্য আল্লাহর কাছে তিনি প্রার্থনা করে বলেছেন,

‘তওফিক দাও খোদা ইসলামে,
মুসলিম জাঁহা পুন হোক আবাদ।’

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম একটা স্তম্ভ হলো যাকাত। যাকাত ধনী ও গরীবের মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক। সমাজের মানুষের মাঝে সাম্য প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে যাকাত প্রদানের কোনো বিকল্প নেই। ধনী যেমন যাকাত দিবে, গরীব মুসলিম সেটা গ্রহণ করবে। এভাবে সকল মুসলিম মিলে একটি ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হবে। যাকাতের ইঙ্গিত দিয়ে কবি বলেন,

‘বুক খালি ক’রে আপনারে সাজ দাও যাকাত,
ক’রো না হিসাবী, আজি হিসাবের অঙ্কপাত!’

ধনীরা যদি আল্লাহর হুকুম মেনে সময়মতো যাকাত প্রদান করত, তাহলে মানুষের দরিদ্রতা অনেকাংশে কমে যেত। মানুষকে যাকাত প্রদানে উৎসাহ দিয়ে ইসলামী রেনেসাঁর কবি নজরুল বলেছেন,

‘দে জাকাত দে জাকাত তোরা দেরে জাকাত
তোর দিল খুলবে পরে ওরে আগে খুলুক হাত॥
দেখ পাক কোরআন শোন নবীজীর ফরমান
ভোগের তরে আসেনি দুনিয়ায় মুসলমান
তোর একার তরে দেননি খোদা দৌলতের খেলাত॥
তোর দরদালানে কাঁদে ভুখা হাজারো মুসলিম
আছে দৌলতে তোর তাদেরও ভাগ বলেছেন রহিম
বলেছেন রহমানুর রাহিম, বলেছেন রসুলে কারিম।’

জাহেলি যুগে নারীদের কোনো অধিকার ছিল না, মর্যাদা ছিল না, তাদেরকে ভোগ্য পণ্যরূপে ব্যবহার করা হতো। তাদের মুক্তির দূত হিসেবে আগমন করেন নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। ইসলামই প্রথম তাদেরকে পূর্ণ মর্যাদা দেয়, অধিকার দেয়। নারীর ওপর পুরুষের যেমন অধিকার আছে, তেমনি পুরুষের ওপর নারীরও অধিকার আছে। কবি নজরুল তার

কবিতায় সেটিই প্রমাণ করে বলেন,

‘নারীরে প্রথম দিয়াছি মুক্তি নর- সম অধিকার
মানুষে গড়া প্রাচীর ভাঙ্গিয়া করিয়াছি একাকার,
আঁধার রাতের বোরখা উতারি এনেছি আশায় ভাতি।
আমরা সেই সে জাতি॥’

মুসলিমদের ধর্মীয় উৎসব ঈদ। ঈদ হলো মুসলিম জাতির আত্মার মিলন। ইসলাম শান্তির বাণী নিয়ে ধনী-গরীব সকলের গৃহে আনন্দের প্লাবন বইয়ে দেয়। ঈদ এমন একটি উৎসব, যেখানে মুসলিম জামাআত সকল বাধা, শঠতা ভুলে গিয়ে এক কাতারে শামিল হয়। কবির ভাষায়,

‘ইসলাম বলে, সকলের তরে মোরা সবাই,
সুখ-দুখ সম-ভাগ করে নেব সকলে ভাই।’

মুসলিমদের ধর্মীয় দুটি উৎসবের একটি হলো ঈদুল আযহা। এই ঈদে ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা ইবরাহীমী সুন্নাত পালন করার জন্য পশু কুরবানী করে। একদা মৌলভী তরিকুল আলম এক প্রবন্ধ লিখে বললেন, কুরবানীতে অকারণে পশু হত্যা করা হয়, এমন ভয়াবহ রক্তপাতের কোনো মানে নাই। নজরুল ‘কোরবানি’ কবিতায় এর তীব্র প্রতিবাদ করে বলেন,

‘ঐ খুনের খুঁটিতে কল্যাণ-কেতু, লক্ষ্য ঐ তোরণ!
আজ আল্লার নামে জান কোরবানে ঈদের পূত বোধন।
ওরে হত্যা নয় আজ ‘সত্যাগ্রহ’, শক্তির উদ্বোধন।’

মুসলিম উম্মাহ আজ বিভিন্ন দল, মত, ইজম, মতবাদে ক্ষতবিক্ষত। মুখে আল্লাহর আধিপত্য স্বীকার করলেও ইসলামের রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধারণ না করে ইসলাম থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে; বরংচ ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদের বস্তাপচা মতবাদসমূহ ও তন্ত্র-মন্ত্রকে আঁকড়ে ধরছে। মুসলিম জাতির এই করুণ ও দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা দেখে কবি নজরুল দুঃখ করে বলেছেন,

‘জাগে না সে জোশ লয়ে আর মুসলমান
করিল জয় যে তেজ লয়ে দুনিয়া জাহান॥
নাহি সাচ্চাই সিদ্দিকের,
উমরের নাহি সে ত্যাগ আর,
নাহি সে বেলালের ইমান,
নাহি আলির জুলফিকার,
নাহি আর সে জেহাদ লাগি
বীর শহিদান॥
নাহি আর বাজুতে কুওত
নাহি খালেদ-মুসা-তারেক,
নাহি বাদশাহি তখ্‌ত তাউস,
ফকির আজ দুনিয়ার মালিক,
ইসলাম কেতাবে শুধু,
মুসলিম গোরস্থান॥’

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন বাংলা সাহিত্যের মধ্যাহ্ন আকাশের সূর্যের মতো তাঁর আলোকরশ্মি ছড়িয়ে দিয়েছেন, নজরুল তখন বিজয় কেতন উড়িয়ে বাংলা সাহিত্যে তাঁর আগমনী বার্তা ঘোষণা করেছেন। কবি যে কাব্য চর্চা করেছেন তা নিজেকে কবি হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নয়; তাঁর এ কাব্য চর্চাও ছিল এ দায়িত্বানুভূতিতে পরিপূর্ণ। তিনি নিজেই বলেছেন, ‘আমার কবিতা আমার শক্তি নয়, আল্লাহর দেওয়া শক্তি আমি উপলক্ষ্য মাত্র। বীণার বেণুতে সুর বাজে কিন্তু বাজান যে গুণী, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। আমার কবিতা যারা পড়েছেন তারাই সাক্ষি; আমি মুসলিমদেরকে সংঘবদ্ধ করার জন্যই তাদের জড়ত্ব, অলস্য, কর্মবিমুখিতা, ক্লৈব্য, অবিশ্বাস দূর করার জন্য আজীবন চেষ্টা করেছি’।

তিনি বাংলার মুসলিমদের সর্বদা শির উঁচু করে দাঁড়াবার জন্য আহ্বান করেন। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট মাথা নত করাকে ঘৃণা করতেন। মুসলিম জাতির জাগরণের বাণী শুনিয়েছেন তিনি ঘুমন্ত জাতিকে। স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তাদের দায়িত্বের কথা। বিশ্বের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্যই আল্লাহ এ মুসলিম জাতিকে দায়িত্ব দিয়েছেন। তিনি তাঁর গানে কবিতায় সে কথায় নানাভাবে মুসলিমদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

পরিশেষে এতটুকুই বলতে চাই, কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন একজন মুসলিম বিদ্রোহী কবি। বাংলার আপামর জনসাধারণের মানসপটে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন, সাথে ইসলামের বিজয়বাণী উচ্চারণেও তাঁর বলিষ্ঠ শব্দস্রোত মুসলিম সমাজকে আন্দোলিত করেছে।

দু‘আ করি আল্লাহ তার ভুলত্রুটি ক্ষমা করে উত্তম প্রতিদান দান করুন- আমীন!

ঈদ উৎসব : আনন্দ-উল্লাস প্রকাশের কতিপয় শিষ্টাচার ও বর্জনীয় আমলসমূহ

*[১ শাওয়াল, ১৪৪৪ হি. মোতাবেক ২২ এপ্রিল, ২০২৩। পবিত্র হারামে মাক্কীতে (কা'বা) ঈদুল ফিতরের খুৎবা প্রদান করেন **শায়খ ড. ছালেহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হুমাইদ** হাফিযাহুল্লাহ। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর আরবী বিভাগের সম্মানিত পিএইচডি গবেষক **আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ**। খুৎবাটি **'মাসিক আল-ইতিছাম'**-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]*

প্রথম খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্যই। যাবতীয় প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য যিনি আপন মহিমা ও মর্যাদার একচ্ছত্র অধিপতি। তিনিই একমাত্র চিরস্থায়ী। তিনিই মহান আল্লাহ, যার পরিচয় লাভের মাধ্যমে সৎব্যক্তিদের অন্তর তাঁর নৈকট্য লাভ করে। আর যিকিরকারীদের নাফস তার উত্তম প্রশংসার মাধ্যমে পবিত্রতা লাভ করে। আরো প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি শঙ্কিতদের আশা দেওয়ার মাধ্যমে নিশ্চয়তা দিয়েছেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, এমন প্রশংসা যা অফুরন্ত, পবিত্র ও কল্যাণময়।

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। লা ইলাহা ইল্লাহু আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ। তিনি জিন ও ইনসানকে একমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। তাদেরকে স্বীয় নেয়ামত দান করেছেন, যাতে তারা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক ও তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। লা ইলাহা ইল্লাহু আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ। আল্লাহু আকবার কাবীরা ওয়াল হামদুলিল্লাহি কাছীরা ওয়া সুবহানাল্লাহি বুকরাতাও ওয়া আছীলা।

অতঃপর, হে মানুষ সকল! আমি প্রথমে নিজেকে, অতঃপর আপনাদেরকে আল্লাহভীতির অছিয়ত করছি। আপনারা আল্লাহকে ভয় করে চলুন। এই জীবনে অনেক কর্মই তো সম্পাদন করলেন, কত সঙ্গী-সাথীকেই তো বিদায় জানালেন? কালের প্রবাহে কত ঘটনারই তো সাক্ষী আপনি, জীবনে অনেক ঋতু ও অবকাশকালীন সময়-ই তো অতিবাহিত করলেন? অতএব, এখন নিজেকে তাক্বওয়াশীল ও একনিষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত করে ইখলাছের উপর অটল রাখুন। আপনারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর পসন্দমূলক কাজের দিকে নিজেকে অগ্রগামী করুন। আর প্রতিটি মানুষ তার কর্মফলের সাথে সংযুক্ত থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ﴾ 'সেদিন মানুষ প্রত্যক্ষ করবে যা সে সামনে প্রেরণ করেছে' *(আন-নাবা, ৭৮/৪০)*।

হে মুসলিমগণ! আপনাদের প্রতি ঈদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের পক্ষ থেকে সৎআমলগুলো কবুল করুন। আল্লাহ আপনাদের ছিয়ামকে কবুল করুন। তিনি আপনাদের ক্বিয়ামকে কবুল করুন। তিনি আপনাদের তেলাওয়াতকে কবুল করুন। তিনি আপনাদের ছাদাক্বাকে কবুল করুন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। অতঃপর সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্যই। এখানে মাসজিদে হারাম, মাসজিদে নববীসহ সকল পবিত্র স্থানসমূহ আজ উমরাকারী, যিয়ারতকারী, ছালাত আদায়কারী, তাকবীর পাঠকারী, ই'তিকাফকারী ও রুকূ-সিজদাকারীদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। উদ্ভাসিত হয়েছে এই বরকতপূর্ণ দেশ সঊদী আরব। সে তার ভূখণ্ডে অবস্থিত সকলকে স্বাগত ও সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছে এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে। এর সরকারপ্রধান তাদের অভ্যর্থনা জানাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

আপনাদেরকে ঈদের শুভেচ্ছা। ঈদুল ফিতরের মধ্যে আল্লাহ তাআলার অনুমতিক্রমে আপনাদের জন্য দুটি খুশির সময় রয়েছে। (১) ঈদুল ফিতরের খুশি এবং (২) মহান রবের সাথে সাক্ষাতের খুশি। এটি ছিয়াম, ঈদুল ফিতর, ইসলামী বিভিন্ন রীতি-নীতি পালনের মধ্য দিয়ে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের মহান দৃশ্য অবলোকনের আনন্দ, যার মাধ্যমে মহা সফলতা লাভের আশা করা হয়। এই ভূখণ্ডে যেন কল্যাণ ও সম্মানিত জীবিকা ছড়িয়ে পড়ে, কুচক্রীদের চক্রান্ত ও অবাধ্যদের শত্রুতা থেকে আল্লাহ তাকে হেফাযত করেন। হে আমাদের রব! আমরা একমাত্র আপনারই পবিত্রতা ঘোষণা করছি। মহিমান্বিত প্রশংসা আপনার জন্যই এবং আপনার নামের দ্বারা পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের ভাই এবং এই বরকতপূর্ণ নগরী ফিলিস্তীন ও মাসজিদে আক্বছার অধিবাসীদের সাহায্য করুন। হে আল্লাহ! আপনি তাদের জন্য পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী হয়ে যান। হে আল্লাহ! আপনি দখলদারদের অপবিত্রতা থেকে মাসজিদে আক্বছাকে পবিত্র করুন। হে আল্লাহ! আপনি বায়তুল আক্বছার সম্মান ও গৌরবকে সমুন্নত করুন। হে বিশ্বজগতের রব! আপনি বায়তুল মাক্বদিসকে বিরুদ্ধবাদীদের শত্রুতা থেকে হেফাযত করুন। তারা পবিত্র স্থানসমূহের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করেছে এবং হারাম বিষয়সমূহকে

নিজেদের উপর বৈধ করে নিয়েছে। তারা মসজিদ ও বরকতপূর্ণ জায়গাসমূহকে অপবিত্র করেছে। হে আল্লাহ! আপনি তাদের খারাপী ও ক্ষতিকে প্রতিরোধ করুন এবং তাদের কূটকৌশল ধূলিসাৎ করে দিন। আর সর্বোপরি আপনার কাছে তাদের খারাপী থেকে আশ্রয় কামনা করছি।

হে মুসলিমগণ! মানুষের অন্তরে আনন্দ প্রবেশ করানো ও তাদের অন্তরকে সৌভাগ্যময় করা এবং তাদের মুখে হাসির ঝিলিক অঙ্কিত করা আর সর্বোপরি তাদের অন্তরকে খুশি করা এমন একটি মহৎ কাজ যা কেবল পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র আত্মার অধিকারী ব্যক্তিরাই গ্রহণ করে থাকে। মানুষের অন্তরে আনন্দ-উল্লাসের অনুপ্রবেশ ঘটানো দ্বীনের মূল্যবান বিষয়সমূহের অন্তর্গত। হাদীছে এসেছে, আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ لَقِيَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ بِمَا يُحِبُّ لِيَسُرَّهُ سَرَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‘যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাকে আনন্দিত করাকে পসন্দ করে, আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতের দিন খুশী করবেন’।[১]

হে মুসলিমগণ! আল্লাহ তাআলা পবিত্রতা অর্জন ও সজ্জিত হওয়াকে হালাল করার ন্যায় রসিকতা করাকেও হালাল করেছেন। আর কৌতুক-রসিকতা করার পদ্ধতি হলো, কাউকে কষ্ট দেওয়া ব্যতীত কোমল আচরণের সাথে আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ করা। রসিকতার মাধ্যমে অন্তর পরিশুদ্ধ হয়, রূহ ঘনিষ্ট হয়। এর দ্বারা অন্তর পরিপূর্ণতা লাভ করে, কষ্ট লাঘব হয় এবং দূরের লোকজন ঘনিষ্ট হয়। রসিকতার মাধ্যমে নিঃসঙ্গ ব্যক্তিও ঘনিষ্ট হয়। হে মুসলিমগণ! নিশ্চয় রসিকতা করা শরীআতসম্মত ও সুন্নাহ। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে রসিকতা করতেন এবং তাঁর তিরোধানের পরে তাঁর ছাহাবীগণ রসিকতা করেছেন। তাদের পরে তাবেঈন ও উম্মাহর সর্বোত্তম মর্যাদাবান ব্যক্তিরাও রসিকতা করেছেন। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের সাথে কৌতুকও করেন? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا ‘তবে আমি সত্য ব্যতীত কিছু বলি না’।[২] আব্দুল্লাহ ইবনে হারেছ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেয়ে আর কাউকে বেশি মুচকি হাসতে দেখিনি’।[৩]

হে প্রিয় বন্ধুগণ! ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম এবং তাদের পরবর্তী সালাফগণ রাহিমাহুমুল্লাহ উম্মাহর সর্বোত্তম ও সর্বাধিক জ্ঞানী এবং অধিক আল্লাহ ভীতি অর্জনকারী ছিলেন। তদুপরি তাদের সত্যনিষ্ঠ অবস্থাও তাদেরকে রসিকতা করা থেকে বিরত রাখেনি। তবে এই রসিকতা তাদের দানশীলতা, উত্তম জীবনাচারণ ও দ্বীনের উপরে অটল থাকার ব্যাপারে প্রভাব ফেলত। আবূ বকর ইবনে আব্দুল্লাহ আল-মুযানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছাহাবীগণ একে অপরের প্রতি তরমুজ নিক্ষেপ করেও রসিকতা করতেন। কিন্তু তারা কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন হলে যোগ্য পুরুষই প্রতিপন্ন হতেন।[৪]

ছাহাবায়ে কেরাম তাদের পরিবার-পরিজনের সাথে হাসি-রসিকতা করতেন। বিশেষত তারা নিজ পরিবারের সাথে বেশি বেশি রসিকতা করতেন। তবে তাদের রসিকতার মধ্যে নৈতিকতা বিবর্জিত কিছু থাকত না। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলতেন, ‘একজন পুরুষের জন্য উচিত হলো, স্বীয় পরিবারের সাথে শিশুসুলভ আচরণ করা। কিন্তু তাদের কাছে কোনো কিছু চাওয়া হলে তাদেরকে যোগ্য পুরুষ হিসাবেই পাওয়া যাবে’।

অতঃপর, আল্লাহ আপনাদেরকে হেফাযত করুন। আপনাদের প্রতি রহম করুন। আমি আবারো আপনাদেরকে ঈদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। আর নিশ্চয় কৌতুক-রসিকতা স্বভাবগতভাবেই মানুষ পসন্দ করে থাকে। কেননা হাসি-কৌতুক অন্তরের বিনোদনের খোরাক ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দূর করার মাধ্যম। সর্বোপরি, আমরা অভিশপ্ত শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

بَارَكَ اللهُ لي ولكم في القرآن العظيم ...

দ্বিতীয় খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা আল্লার জন্য যিনি একচ্ছত্র মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী। আল্লাহ মহান, যিনি স্বীয় হুকুম বাস্তবায়নকারী। তাঁর ইহসান ও ন্যায়পরায়ণতা সর্বদা বিদ্যমান। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা আবশ্যক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি সুউচ্চ, মহান। তিনি মানুষকে হাসান ও কাঁদান। তিনি মৃত্যু দেন ও আবার জীবিত করেন। একমাত্র তাঁরই রয়েছে অসংখ্য সুন্দর নাম। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আমাদের নেতা ও নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। তিনি হেদায়াতপ্রদর্শনকারী নবী। জাহান্নামের আগুন থেকে সতর্ককারী। তিনি পবিত্র জীবন-চরিতের অধিকারী। তিনি মোহনিয়া চরিত্রের অধিকারী। এছাড়াও তিনি উজ্জ্বল মু‘জিযার অধিকারী। আল্লাহ তাঁর উপর দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও ছাহাবীগণের উপর শান্তি বর্ষণ করুন— যারা চরিত্র, সহনশীলতা ও দয়া

১. ত্বাবারানী, মু‘জামুছ ছাগীর, হা/১১৭৮; সনদ হাসান।
২. তিরমিযী, হা/১৯১৩; আহমাদ, হা/৮৩৬৬; সনদ হাসান।
৩. তিরমিযী, হা/২৮৮০, হাদীছ ছহীহ।
৪. ইমাম বুখারী, আদাবুল মুফরাদ, হা/২৬৫।

প্রদর্শনের দিক দিয়ে মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ছিলেন। আর তাঁর পদাঙ্ক ও সুন্নাহর অনুসরণকারী সকলের প্রতি অবারিত ধারায় শান্তি অবতীর্ণ হোক।

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। লা ইলাহা ইল্লাহু আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

হে মুসলিমগণ! আপনারা আল্লাহকে ভয় করে চলুন। আর জেনে রাখুন! নিশ্চয় ঈদের সাথে আনন্দ-উৎসব, আত্মার পরিশুদ্ধতা ও আত্মার ন্যায়পরায়ণ হওয়ার এক মহান সম্পর্ক রয়েছে। সাথে সাথে হিংসা-বিদ্বেষের পঙ্কিলতা থেকে নিজেকে মুক্ত করা। নিজের থেকে শত্রুতা ও ঘৃণার কারণগুলো দূরীভূত করা। আনন্দের অনুপ্রবেশ করানো খুবই সহজ কাজ। আপনি উত্তম কথা ও হাসিমাখা চেহারা দিয়ে আপনার ভাইকে খুশি করুন। অথবা আপনার সাধ্যের মধ্যে হাদিয়া কিংবা দান করার মাধ্যমে খুশি করুন। আপনি আপনার ভাইয়ের দাওয়াত কবুল করা অথবা তার সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে তাকে আনন্দিত করতে পারেন। সেই ব্যক্তি কোথায়, যার ভাগ্য হ্রাস পেয়েছে, স্বভাব রূঢ় হয়েছে। যার পোশাক বৃদ্ধি পেয়েছে আর নেকী হ্রাস পেয়েছে? যার শরীর সুঠাম, কিন্তু অন্তর শূন্য। পকেট (অর্থ দিয়ে) ভর্তি, কিন্তু ছহীফা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। যে যমীনে খুবই আলোচিত ব্যক্তি, কিন্তু আসমানে পরিত্যাজ্য। এমন অবস্থা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাচ্ছি। আপনারা আনন্দ ও উল্লাস প্রকাশ করুন এবং আপনাদের নিকটতম সকলের মাঝে আনন্দকে ছড়িয়ে দিন। অতঃপর আনন্দিত হওয়া অন্তরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভের উঁচু স্তর। আপনারা রবের সন্তুষ্টি লাভ, নিজেকে পাপ থেকে মুক্তকরণ ও আপনাদের সৎআমলগুলোকে বৃদ্ধি করার মধ্য দিয়ে ঈদের আনন্দ উৎযাপন করুন।

পিতা-মাতার সন্তুষ্টি অর্জন, ভ্রাতৃত্ব বন্ধন দৃঢ়করণ, আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষা করা, মিসকীনকে খাবার খাওয়ানো, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করা, ভীত-সন্ত্রস্ত ব্যক্তিকে নিরাপত্তা দেওয়া, যুলমকে প্রতিরোধ করা, ইয়াতীমের দায়িত্ব নেওয়া ও রুগীর সেবা-শুশ্রূষা করার মধ্য দিয়েই ঈদের প্রকৃত আনন্দ প্রকাশ পায়। আপনারা আপনাদের দূরতম আত্মীয়দের অভিভাদন জ্ঞাপন করুন— আল্লাহ আপনাদের প্রতি দয়া করবেন। আপনারা আপনাদের রবের সীমারেখাকে আঁকড়ে ধরুন। আপনারা দীর্ঘ জীবনে হারাম কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখুন।

জেনে রাখুন! নিশ্চয় রামাযান পরবর্তী সময়ে ইহসানের বাহ্যিক নিদর্শন হলো, বান্দার আনুগত্যের উপরে অটল থাকা এবং কল্যাণের দ্বারা কল্যাণের অনুসরণ করা। আপনাদের নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আপনাদেরকে রামাযান মাসের পরে শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। যে ব্যক্তি এই ছয়টি ছিয়াম রাখল, সে যেন সারা বছর ছিয়াম রাখল। আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের পক্ষ থেকে এই ছিয়ামকে কবুল করুন। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর যিকির, শুকর আদায় ও উত্তম ইবাদত করার জন্য সাহায্য করুন।

আল্লাহ মহান, তিনি সবকিছু নতুনভাবে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ মহান, তিনি প্রতিটি জিনিস প্রথম সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى﴾ ‘নভোমণ্ডলে, ভূমণ্ডলে, এতদুভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে এবং সিক্ত ভূগর্ভে যা আছে, তা তাঁরই’ *(ত্বো-হা, ২০/৬)*। আল্লাহ মহান, আমাদের রব কতইনা অনুগ্রহ ও কল্যাণ দান করেছেন। আল্লাহর জন্যেই বড়ত্ব, আর তিনি তার নেয়ামত ও বরকত থেকে বান্দাদের যা দান করেছেন।

হে আল্লাহ! আমরা আপনার সৃষ্টিসমূহের মধ্যকার সৃষ্টি। আমরা আপনার দান থেকে অমুখাপেক্ষী নই। হে আল্লাহ! আমাদের পাপের কারণে আমাদের থেকে আপনার অনুগ্রহ উঠিয়ে নিয়েন না। আমরা একমাত্র আল্লাহর উপরেই ভরসা করছি। কুরআনে বর্ণিত আছে, ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ ‘হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে যালেম ক্বওমের ফেতনার পাত্র বানাবেন না’ *(ইউনুস, ১০/৮৫)*। অন্য আয়াতে এসেছে, ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ ‘হে আমাদের রব! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দান করুন ও আখেরাতে কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে আমাদেরকে রক্ষা করুন’ *(আল-বাক্বারা, ২/২০১)*।

আত্ব তাক্বওয়া স্টোর
নির্ভেজাল পন্যের প্রচেষ্টায়, ইন শা আল্লাহ
AT TAQWA STORE
আমাদের পেইজে থাকা পণ্যসমূহ ও মুল্য তালিকা :
- লিচু ফুলের মধু - ৫৫০ টাকা/কেজি
- কালিজিরা মধু - ৯৬০ টাকা/কেজি
- খাঁটি গাওয়া ঘি - ১৩০০ টাকা/কেজি
- মেশিনে ভাঙানো সরিষার তেল - মুল্য জানতে কল করুন
- ঘানি ভাঙ্গা সরিষার তেল - মুল্য জানতে কল করুন
- কালোজিরার তেল - ১০০ মিলি - ১৮০ টাকা
- খেজুরের গুড় - ২৭০ টাকা/কেজি

১৫০০ টাকার অর্ডার করলে কুরিয়ার চার্জ ফ্রি
অর্ডার করতে কল করুন : ০১৫৭৫ ২৪৫ ৮৭২

চোরা স্রোতে হারিয়ে যেয়ো না

-নোমান আব্দুল্লাহ*

সময়ের সাথে সাথে মননের চাহিদার প্রেক্ষিতে আধুনিকতার স্বাদ মেটাতে গিয়ে আমরা শুধু তাকিয়েছি বাহ্যিকভাবে জাঁকজমকপূর্ণ দুনিয়াকে জান্নাত জ্ঞান করা জাতির দিকে। আমরা মেনেছি এটাই আধুনিকতা। সময়ের সাথে পা মেলাতে হলে আমাদের তা-ই গ্রহণ করা উচিত। কৈশরের এই উচ্ছ্বাস ভাঙার সময়ে আমরা পরিচিত হয়েছি অশ্লীল, অর্ধ-উলঙ্গ, উলঙ্গ সব সংস্কৃতির সাথে। বাড়ন্ত বয়সের দুরন্ত সময়েও আমরা শান্ত, নির্জীব, নিস্তেজ। ফলশ্রুতিতে নিজেদের ক্বলবকে করছি অসুস্থ, ভেসে যাচ্ছি সেই পাথরপূর্ণ স্রোতঃস্বিনী নদীর পানিতে যার পথিমধ্যেই অপেক্ষমাণ এক সুবিশাল মরণ ফাঁদের ঝরনা। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ 'তোমরা যেনা-ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না, নিশ্চয় এটি অশ্লীল ও মন্দ কাজ' *(বনী ইসরাঈল, ১৭/৩২)*।

বন্ধুরা! একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করুন— আল্লাহ তাআলা তো এভাবেও বলতে পারতেন, 'তোমরা যেনা-ব্যভিচার করো না'। কিন্তু তিনি এখানে বলেছেন, 'তোমরা এগুলোর কাছেও যেয়ো না'। অর্থাৎ যে বিষয়গুলো যেনা-ব্যভিচারকে প্ররোচিত করে তার থেকেও দূরে থাকতে বলেছেন।

কারণ প্রথমেই কোনো ব্যক্তি যেনা করে ফেলে না; কোনো না কোনোভাবে এই অপকর্মের বীজ তার অপত্য মনে রোপিত হয় ও কালক্রমে তার পাতা, ডালপালা গজায়, অবশেষে মাকাল ফল হিসেবে এই মারাত্মক অপকর্ম সংগঠিত হয়। এক্ষেত্রে প্ররোচনা জন্মানোর প্রথম ধাপ হিসেবে আমাদের সুশীল সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে থাকা সংস্কৃতির অর্ধ-উলঙ্গ অংশকে দায়ী করা যায়। সেই দুনিয়াকে জান্নাত জ্ঞান করা জাতির মতোই আমাদের সংস্কৃতির কাণ্ডারিরা মুসলিম মেয়েদেরও সেই বিধর্মী মেয়েদের মতোই অর্ধ-উলঙ্গ করে সমাজে উপস্থাপন করছে। একদিক থেকে আমাদের ঘায়েল করছিল বিধর্মীদের অশ্লীলতা নামক অস্ত্র এবার সে স্রোতেই গা ভাসালো অন্তরে মোহরযুক্ত কিছু বিকৃত মানুষ। ধর্মীও বিধিনিষেধ উপেক্ষার ধারায় রেখে ভাইরাসের মতো তারা অশ্লীলতা ইনজেক্ট করতে থাকল আমাদের মুসলিম সমাজেও।

ফলে মননে জন্মাচ্ছে অতৃপ্ত চাহিদা, প্রভাবিত হচ্ছে মন ও শরীরের নানানদিক, আমরা ছুটছি আরও গভীর রহস্য উন্মোচনে। পরিচিত হচ্ছি আরও খোলামেলা সব দৃশ্যের সাথে। অতঃপর বিমোহিত হয়ে মাতালের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি সেই অপসংস্কৃতির গোলকধাঁধার বৃত্তপথেই। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'প্রত্যেক যেনাকার ও যেনাকারিণী ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত উলঙ্গ অবস্থায় আগুনে জ্বলতে থাকবে'।[১]

তাই আমাদের অবশ্যই অবশ্যই সাবধান থাকা উচিত এই মরণ ফাঁদের ঝরনা থেকে। তার সুদৃশ্যের জলরাশি থেকে। আমরা তো জানি এ নদী চোরা স্রোতে পূর্ণ, টলমলে পানির স্বাদ নিতে গেলেই টেনে নেবে ভয়ংকর পরিণতির দিকে। যেখানে কোনো পানি-ই নেই, আছে শুধু এ দুনিয়ার চেয়ে ৭০ গুণ তীব্র আগুনে পোড়া পাপীদের বিগলিত দেহ, রক্ত, পুঁজে ঠাসা বিশ্রী সব তরল। আর অবশ্যই অবশ্যই এটি সেই জায়গা যেখানে কেউ পরিমাপের দিক দিয়ে সর্বনিম্ন সময়ও থাকতে চাইবে না।

বন্ধু! বলো, এ দুর্গন্ধযুক্ত দুনিয়া আর কত দিনের? যার জন্য তুমি আল্লাহর ওয়াদাকৃত জান্নাতের বর্ণনাতীত নেয়ামত ছেড়ে ঐ সীমাহীন যাতনার স্থানে পৌঁছাবে। বলো, তুমি কি এতই বোকা! মহান আল্লাহ তো সেই সুবাসিত মনোমুগ্ধকর জান্নাতে এমন হূর রেখেছেন যাদের উদীয়মান সূর্য দেখলেও লজ্জা পায়...। তো তুমি এ পচনশীল দুনিয়ায় কীসের মোহে ডুবে আছো? কীসে তোমাকে ভুলিয়েছে সেই অনন্ত সুখ থেকে, সেই চিরযৌবনা অতুলনীয় রমণীদের থেকে!

তাই সেই অনন্ত সুখময়তার জন্য পাপাচার থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য আমরা এসব চোখধাঁধানো অসুস্থ অপসংস্কৃতি থেকে বেঁচে থাকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ এবং আল্লাহর কাছে এভাবে দু'আ করব যে, 'হে আল্লাহ! আপনি আমার চিন্তায় নূর দিন, মননে নূর দিন, চোখেও নূর দান করুন ও তার পর্দা করার তাওফীক্ব দিন এবং আমাদের দান করুন সেই সুবাসিত জান্নাত, যা আপনি আপনার মুমিন বান্দাদের জন্য সংরক্ষিত রেখেছেন'। আল্লাহ কবুল করুন- আমীন!

* খরমপট্টি, কিশোরগঞ্জ।

১. ছহীহ বুখারী, মিশকাত, হা/৪৬২১।

মনীষী পরিচিতি-৬ : আল্লামা রঈস নাদভী রাহিমাহুল্লাহ

-আল-ইতিছাম ডেস্ক

ভূমিকা : সালাফী দাওয়াত ও মানহাজের খেদমতে যারা শক্তিশালী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তাদের মধ্যে আল্লামা রঈস নাদভী রাহিমাহুল্লাহ অন্যতম ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, বানারসের শায়খুল হাদীছ, মুফতী এবং ভারতবর্ষের একজন প্রসিদ্ধ মুহাক্কিক ও আলেমে দ্বীন ছিলেন। তিনি সাধারণ জনতারই শুধু আলেম ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন বড় বড় আলেমদের উস্তায। বড় বড় আলেমগণ সর্বদা তাঁর কাছে ভিড় করে থাকতেন ইলম হাছিলের জন্য। তিনি 'ইলমের বিশ্বকোষ' হিসেবে পরিগণিত হতেন। নিম্নে তাঁর সম্পর্কে যৎকিঞ্চিত আলোচনা পেশ করা হলো—

জন্ম : আল্লামা রঈস নাদভী বিন সাখাওয়াত রাহিমাহুল্লাহ। তিনি উত্তরপ্রদেশের সিদ্ধার্থনগরে ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবন : তিনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর নিজ এলাকাতেই সম্পন্ন করেন। ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি লাখনৌ গিয়ে দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায় ভর্তি হন এবং তিনি ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে আলেমিয়াত তথা একাডেমিক পড়াশোনা সমাপ্ত করেন। নদওয়াতুল উলামায় অধ্যয়নের কারণে তাঁর নামের শেষে নাদভী লেখা হয়। উল্লেখ্য, তিনি হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি তাহক্বীক্বী অধ্যয়নের দ্বারা আহলেহাদীছ হয়ে আহলেহাদীছ বিদ্বানদের উস্তাযরূপে নিজেকে তুলে ধরতে সক্ষম হন। *আল-হামদুলিল্লাহ।*

উস্তায : আল্লামা রঈস নাদভী রাহিমাহুল্লাহ-এর উল্লেখযোগ্য উস্তাযদের মধ্য হতে সাইয়্যেদ আবুল হাসান নাদভী, মুনশী মঈনুল হক্ব, মাওলানা আব্বাস নাদভী, মাওলানা আব্দুল গাফফার নাদভী, মাওলানা আসবাত সাহেব প্রমুখ রাহিমাহুমুল্লাহ।

ছাত্র : তাঁর অসংখ্য ছাত্রের মধ্য হতে ড. রেযাউল্লাহ, শায়েখ ছালাহুদ্দীন মাক্ববূল, শায়েখ ওয়াসিউল্লাহ মুহাম্মাদ আব্বাস (মক্কার মুদাররিস), শায়েখ উযায়ের শামস প্রমুখ হাফিযাহুমুল্লাহ উল্লেখযোগ্য।

তাদরীসী খেদমত : ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দ হতে দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা হতে ফারেগ হওয়ার পর থেকে তিনি প্রথমে মাদরাসা বাদরিয়াতে দারস প্রদান শুরু করেন। অতঃপর তিনি জামি'আহ সিরাজুল উলূম ঝান্ডানগর, নেপালে দায়িত্ব পালন করেন। এটির পরিচালনায় বিশ্ববিখ্যাত আলেমে দীন আল্লামা আব্দুর রঊফ ঝান্ডানগরী রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন, যাকে খত্বীবুল ইসলাম এবং খত্বীবুল হিন্দ উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। এরপর আল্লামা রঈস নাদভী জামি'আহ সালাফিয়্যাহ আহমাদিয়া দারভাঙ্গায় শিক্ষকতা করেন। সেখানে তিনি মাজাল্লাতুল হুদা নামক পত্রিকায় দীর্ঘ কলেবরের অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। তিনি ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দ হতে আমৃত্যু জামি'আহ সালাফিয়্যাহতে শিক্ষকতা করে গিয়েছেন। সাথে সাথে গ্রন্থ প্রণয়ন, ফতওয়া প্রদান, অনুবাদ ইত্যাদি দাওয়াতী কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর ৫০ বছরের শিক্ষকতার জীবনে অসংখ্য দক্ষ আলেম তৈরি হয়েছিলেন।

রচনাবলি : তিনি একাধিক ভাষায় মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন— (১) কুরআনে ইয়াহূদীর বর্ণনা (আরবীতে ৪ খণ্ডে সমাপ্ত); ৫ম খণ্ড অর্ধেক সমাপ্ত করার পর পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যায়। (২) তারীখে আহলেহাদীছ হিন্দ। (৩) সীরাতে আদম আলাইহিস সালাম। (৪) সীরাতে আল্লামা নাযীর আহমাদ আমলুবী রহমানী। ৫. আল-লামহাত (৫ খণ্ডে, বঙ্গানুবাদ চলমান); এটি সম্পূর্ণ করার পূর্বে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। (৬) ইসলামে জুম'আর ছালাতের বিধান। (৭) জানাযার মাসায়েল। (৮) হারিয়ে যাওয়া স্বামীর শারঈ বিধান। (৯) গায়ের মুক্বাল্লিদদের হাক্বীক্বত; এটি যামীর কা বুহরান বইয়ের শেষে যুক্ত করা হয়েছে। (১০) নবী আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছালাতের পদ্ধতি। (১১) তাছহীহুল আক্বায়েদ বি-ইবতালি শাওয়াহিদিশ শাহেদ। (১২) কাশফুল গুম্মাহ বি-সিরাজিল উম্মাহ।

সন্তানসন্ততি : তিনি দুটি বিবাহ করেছিলেন। প্রথম পক্ষের একটি সন্তান এবং দ্বিতীয় পক্ষের পাঁচজন কন্যা এবং একজন পুত্র সন্তান ছিল। যার নাম আব্দুল হক্ব।

মৃত্যু : আল্লামা রঈস নাদভী সাহেব ১৪৩০ হিজরী মোতাবেক ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দে ১০ই মে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিঊন।* আল্লাহ তাকে জান্নাতবাসী করুন। তার সকল খেদমতকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত জারী রাখুন— আমীন!

তথ্যসূত্র :

১. তাছহীহুল আক্বায়েদ, পৃ. ১৬-২১। তাঁরই পুত্র আব্দুল হক্বের লিখনী হতে।
২. মাজমূআ মাকালাত পার সালাফী তাহক্বীক্বী জায়েযা, পৃ. ৫৫-৬১।
৩. আল-লামহাত, পৃ. ৬৭-৯২।

জীবন এত তিতা কেন?

-মো. আরিফুল ইসলাম*

জীবন নিয়ে আমরা সকলেই কমবেশি চিন্তিত। বর্তমান সমাজে হাজারো বেকার যুবক বলছে, আমি আজ বেকার কেন? আমার চাকরি মিলছে না কেন?

একসময় যে বাবা-মা নিজেদের চিন্তা না করে আমাকে ভালো ব্যবস্থাপনা দিতেন, ভালো ভালো খাবার খাওয়াতেন, সুন্দর পোশাক পরিধান করাতেন, আমার সকল ধরনের আবদার পূরণ করতেন আর আজ যখন লেখাপড়া শেষে চাকরি মিলছে না, পথে পথে বেকার হয়ে ঘুরতে হচ্ছে, এমন সময় সেই আদরের বাবা-মাও আমার দিকে অনীহার চোখে তাকান। এমনকি কখনো কখনো আবার বাবা-মা বলেই ফেলেন, সারাজীবন কি বাড়িতেই বসে থাকবি? কোনো চাকরি-বাকরি করতে হবে না?

যখন বাবা-মায়ের মতো আপনজনের মুখে এমন কথা শুনি, তখন নিজেকে বড় অসহায় লাগে। আপনি কি কখনো ভেবে দেখেছেন, আপনার এই অসহায় হওয়ার কারণ কী?

আপনার এই অসহায় হওয়ার কারণ আপনি নিজেই! আপনি একটু পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখেন। আপনার পেছনের সেই মূল্যবান সময়গুলো কীভাবে আপনি অতিবাহিত করেছেন। আপনি আপনার পেছনে ফেলে আসা সময়গুলো যেভাবে অতিবাহিত করেছেন, আজ তারই ফল ভোগ করছেন। কেননা আপনি যদি আমগাছ রোপণ করেন, তাহলে আমগাছ থেকে আপনি আম-ই পাবেন। সেখানে কাঁঠালের আশা করা যায় না।

সুতরাং আপনি শিক্ষাজীবন যেভাবে অবহেলায় কাটিয়ে দিয়েছেন, আজ তারই ফল ভোগ করছেন। আপনি সারাজীবন থেকে এসেছেন নিম গাছতলায় আর আজ বলছেন জীবন এত তিতা কেন? নিম গাছতলায় থাকলে তো জীবন তিতা হবেই।

আপনার ছাত্রজীবনে শিক্ষকগণ যখন ক্লাসে পাঠদান করতেন, তখন আপনি অন্যমনস্ক হয়ে শিক্ষকের পাঠদানকে অবহেলা করে সহপাঠীদের সাথে গল্পে মেতে থাকতেন।

ঠিক সেই সময় আপনার ক্লাসে এমন অনেক ছাত্র ছিল, যারা মনোযোগ সহকারে শিক্ষকের পাঠদান শ্রবণ করত এবং শিক্ষকের বিশেষ বিশেষ উক্তিকে নোট করে রাখত।

দিন গড়িয়ে বিকেল হলে আপনি আপনার বাবার টাকায় কতই না বন্ধু-বান্ধবীদের সাথে ঘোরাঘুরি করতেন। অবহেলায় সময় কাটিয়ে দিতেন। আড্ডা, গান, গল্পে বিভোর হয়ে অবলীলায় দিনের পর দিন চলে যেত, সেদিকে আপনার কোনো ভ্রুক্ষেপই ছিল না। ঠিক সেই সময় আপনার ক্লাসের এমন অনেক ছাত্র ছিল, যারা ক্লাসের পড়া তৈরি করার জন্য বিভিন্ন লাইব্রেরিতে ঘোরাঘুরি করত।

আপনার যে প্রাণাধিক প্রিয় বান্ধবীদের সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটাতেন, আজ আপনি বেকার হওয়ায়, আপনার কাছে অর্থকড়ি না থাকায় তারা আজ আপনার পাশে নেই। তারা আজ কোনো প্রতিষ্ঠিত ছেলের হাত ধরে সংসার করছে। আর আপনি মনে বিষণ্নতা নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছেন। আর দুঃখ প্রকাশ করছেন, হায়! আমার ভাগ্য এত খারাপ কেন?

অবাক করা বিষয় হলো কি জানেন! আপনার ভাগ্য আপনাকে এখানে নিয়ে আসেনি বরং আপনি আপনার ভাগ্যকে এখানে নিয়ে এসেছেন। কারণ আপনার যে সহপাঠীরা শিক্ষকগণের পাঠদান মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেছিল এবং ক্লাসের পর ফাঁকা সময়গুলো বিভিন্ন উপকারী বিষয়গুলো নোট করতে ব্যস্ত ছিল, তাদের দিকে তাকিয়ে দেখুন, তারা আজ আপনার মতো বেকার নয়; বরং তারা আজ প্রতিষ্ঠিত। তাদেরকে আজ চাকরি খুঁজতে হচ্ছে না। চাকরি তাদেরকে আজ খুঁজছে তাদের যোগ্যতার জন্য।

তারাও আজ রেস্টুরেন্টে খাবার খাচ্ছে। শুধু এতটুকু পার্থক্য, আপনি রেস্টুরেন্টে খাবার খেয়েছিলেন আপনার বাবার টাকায়। আর আপনার সেই পরিশ্রমী সহপাঠী রেস্টুরেন্টে খাবার খাচ্ছে তার নিজের উপার্জিত টাকায়।

আপনি যদি আপনার ছাত্রজীবনের মূল্যবান সময়গুলোকে হেলায় নষ্ট না করে লেখাপড়ায় নিজেকে ডুবিয়ে রাখতেন, তাহলে হয়তো আজ আপনার জীবন এত বিস্বাদময় হতো না, এত তিক্ত হতো না। আপনিও আজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারতেন। আপনিও আজ প্রফুল্লতা অনুভব করতে পারতেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ 'কারণ মানুষ তা-ই পায়, যা সে চেষ্টা করে' *(আন-নাজম, ৫৩/৩৯)*।

তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত হবে, ছাত্রজীবনকে সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য দেওয়া। আমরা যদি ছাত্রজীবনের সময়গুলোকে প্রাধান্য দিতে পারি, তাহলে আমরা আমাদের জীবন থেকে তিক্ততা কাটিয়ে নিতে পারব ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের প্রত্যেককে ছাত্রজীবনকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়ার মাধ্যমে আমাদের জীবন থেকে তিক্ততা কাটিয়ে উঠার তাওফীক্ব দান করেন- আমীন!

* মা'হাদ ২য় বর্ষ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী।

ইউরিন ইনফেকশন : প্রকৃতি, কারণ ও প্রতিকার

-উম্মে মুহাম্মাদ*

সুস্থতা মহান আল্লাহ প্রদত্ত একটি বিশেষ নেয়ামত। যখন আমরা অসুস্থ হই, তখন তার গুরুত্ব উপলব্ধি করি। হাদীছে এসেছে, ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ 'দুটি জিনিসের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ বেশি প্রতারিত হয়, একটি হলো সুস্থতা, অপরটি হলো অবসর'।[১]

আমাদের শরীরে বার্ধক্যজনিত কারণে ভেজাল খাদ্য খাওয়ার কারণে, অসচেতনতা প্রভৃতি কারণে নিজের অজান্তেই রোগ বাসা বাঁধছে। তেমনি আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দার সুস্থতার জন্য সেই রোগ নিরাময়ের জন্য তার ঔষধও পাঠিয়েছেন। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী প্রকট আকার ধারণ করা ইউরিন ইনফেকশন বা প্রস্রাবজনিত সমস্যা, তার উপসর্গ ও তা থেকে মুক্তির উপায় নিয়ে আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

ইউরিন ইনফেকশন বা প্রস্রাবজনিত সমস্যা : মূত্রতন্ত্রের যেকোনো অংশে যদি জীবাণুর সংক্রমণ হয়, তাহলে সেটাকে ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন (UTI) বলা হয়। কিডনি, মূত্রনালি একাধিক অংশে একসঙ্গে এই ধরনের ইনফেকশন হতে পারে। সাধারণত এই সমস্যাটি নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে হলেও নারীদের মধ্যে ইউরিন ইনফেকশনে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বেশি। নানা কারণে মানুষ আজকাল ইউরিন ইনফেকশন বা প্রস্রাবের সমস্যায় ভোগেন। দীর্ঘদিন এ সমস্যায় ভুগলে কিডনি অকেজো হতে পারে। এছাড়াও মূত্রথলিতে নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইউটিআই হলো এক ধরনের ব্যাকটেরিয়াঘটিত সংক্রমণ। যখন এর ফলে মূত্রনালির নিম্নাংশ আক্রান্ত হয়, তখন তাকে মূত্রথলির সংক্রমণ (সিস্টাইটিস) বলে আর যখন এর ফলে মূত্রনালির উর্ধ্বাংশ আক্রান্ত হয়, তখন তাকে কিডনির সংক্রমণ (পায়েলোনেফ্রাইটিস) বলে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে, ই-কলি নামের একটি ব্যাকটেরিয়াই এই রোগের উৎস।

ইউরিন ইনফেকশনের উপসর্গ : ইউরিন ইনফেকশনের প্রধান উপসর্গগুলো হলো— ১. প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া করা, ২. একটু পরপর প্রস্রাব লাগা কিন্তু ঠিকমতো না হওয়া, ৩. প্রস্রাবের রং লালচে হওয়া, ৪. প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত বের হওয়া, ৫. দুর্গন্ধযুক্ত প্রস্রাব, ৬. নারীদের গোপনাঙ্গে ব্যথা অনুভব করা, ৭. পুরুষদের মলদ্বারে ব্যথা অনুভব করা, ৮. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া, ৯. তলপেটে বা পিঠে তীব্র ব্যথা অনুভব করা, ১০. সারাক্ষণ জ্বর জ্বর ভাব অথবা কাঁপুনি দিয়ে ঘনঘন জ্বর হওয়া। বিশেষ করে গরমের দিনে খুব সহজেই মূত্রাশয়ের সংক্রমণ দেখা দিতে পারে।

ইউরিন ইনফেকশনের কারণ :

(১) পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি না খাওয়ার ফলেই বেশিরভাগ মানুষ এই সংক্রমণে ভোগেন। এক্ষেত্রে পানিশূন্যতার কারণে মূত্রথলিতে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বেড়ে যায়।

(২) নারী-পুরুষ অনেকেই টাইট অন্তর্বাস পরেন, যা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। টাইট অন্তর্বাস ব্যবহারের ফলে যৌনাঙ্গ অতিরিক্ত আর্দ্র অবস্থায় থাকে। যার ফলে সেখানে ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধি পায়।

(৩) মলত্যাগের সময় পায়ুপথ থেকে ব্যাকটেরিয়া মূত্রনালিতে প্রবেশ করলে।

(৪) মলত্যাগের পর পায়ুপথে পেছন থেকে সামনের দিকে টয়লেট টিস্যু ব্যবহার করলে টিস্যুর সংস্পর্শে ব্যাকটেরিয়া অনুপ্রবেশ করতে পারে।

(৫) কোষ্ঠকাঠিন্য থাকলে (বিশেষ করে শিশুদের) ইউরিন ইনফেকশনের ঝুঁকি বাড়ে।

(৬) যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম, যাদের ডায়াবেটিস বা ক্যান্সার রয়েছে অথবা যারা ক্যান্সারের ওষুধ নিচ্ছেন তাদের ক্ষেত্রেও এ ইনফেকশনের ঝুঁকি বেশি।

(৭) যারা হাই কমোড ব্যবহার করেন তাদেরও ঝুঁকি বেশি। কারণ কমোডের বসার জায়গায় লেগে থাকা ব্যাকটেরিয়া মূত্রনালিতে চলে আসতে পারে।

(৮) যারা অনেকক্ষণ প্রস্রাব আটকে রাখেন তাদের ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বেড়ে গিয়ে ইউরিন ইনফেকশন হতে পারে।

(৯) ক্যাথিটার লাগালেও ইউরিন ইনফেকশন হতে পারে। তাছাড়া যাদের মূত্রপথে পাথর তৈরি হয় কিংবা প্রস্টেট গ্রন্থি বড় হয় তাদেরও ইউরিন ইনফেকশনের ঝুঁকি বেশি।

(১০) গর্ভাবস্থায় এই ইনফেকশন দেখা দিতে পারে অনেকের।

(১১) মাসিকের রাস্তায় সঠিকভাবে স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার করতে না পারলে কিংবা মাসিকের বর্জ্য মূত্রপথের সংস্পর্শে এসেও ইনফেকশন ঘটাতে পারে।

(১২) মূত্রনালিতে ব্লকেজ তথা কিডনিতে পাথর বা বর্ধিত প্রোস্টেট প্রস্রাবকে মূত্রাশয়েই আটকে দিতে পারে, যা প্রস্রাবে ইনফেকশনের অন্যতম আরেকটি কারণ।

---

* আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪১২; মিশকাত, হা/৫১৫৫।

ইউরিনারি ইনফেকশন প্রতিরোধের উপায় :

(ক) প্রস্রাব আটকে না রাখা : দীর্ঘক্ষণ প্রস্রাব আটকে রাখা হতে পারে ইউরিনারি ইনফেকশনের প্রধান কারণ। প্রস্রাব যদি মূত্রাশয়ে দীর্ঘক্ষণ আটকে রাখা হয়, তাহলে তাতে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বাড়তে থাকে। প্রতি ২০ মিনিটে মূত্রস্থিত ই-কলি ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায়। আর বেশিসংখ্যক ব্যাকটেরিয়া মানে বেশি ব্যথা। তাই নিঃসন্দেহে সেরা উপায় হলো প্রচুর পানি পান করা এবং মূত্রত্যাগের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া বের করে দেওয়া।

(খ) প্রচুর পানি পান করা : যেকোনো রোগের প্রতিরোধক হলো প্রচুর পানি পান করা। ইউরিনারি ইনফেকশনের জন্য এটাই একক এবং সেরা উপায়। গবেষণায় জানা গেছে, প্রচুর পানি পান শুধু মূত্রত্যাগের সময় জ্বালাপোড়াই কমায় না, ইউরিনারি ইনফেকশনও দূর করে।

(গ) ভিটামিন সি জাতীয় খাবার খাওয়া : নিয়মিত ভিটামিন সি গ্রহণ কমিয়ে দিতে পারে ইউরিনারি ইনফেকশনের সম্ভাবনা। দিনে ১০০০ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি গ্রহণে শরীরে যে অম্ল উৎপন্ন হয়, তাতে মূত্রে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের বিস্তার হ্রাস পায়। বিশেষ করে লেবু, টমেটো, কমলালেবু, ব্রকোলি, আমলকি ইত্যাদি খেলে তা সহজেই মোকাবেলা করা যায়। আমলকি একটি অসাধারণ পুষ্টিগুণে ভরপুর ভেষজ ফল। একটি আমলকিতে প্রায় ২০টি কমলার সমান ভিটামিন সি থাকে। ১০০ গ্রাম তাজা আমলকিতে থাকে প্রায় ৪৭০-৬৮০ মিলিগ্রাম খাঁটি ভিটামিন সি। বিজ্ঞানে এ ফলকে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী অ্যান্টি অক্সিডেন্ট হিসেবে দেখানো হয়েছে।

(ঘ) সহবাসের আগে ও পরে প্রস্রাব করা : মিলনের আগে ও পরে মূত্রত্যাগ করা ইউরিনারি ইনফেকশন রোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। পুরুষের চেয়ে নারীর ক্ষেত্রে এটা বেশি কার্যকর।

(ঙ) গরম পানিতে গোসল করা : ইউরিনারি ইনফেকশনের ফলে সৃষ্ট ব্যথা উপশমে কুসুম গরম পানিতে গোসল অনেকের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

(চ) স্বাস্থ্যবিধি পালন করা : ঢিলেঢালা পোশাক পরা, সুতি কাপড়ের অন্তর্বাস ব্যবহার করা, নিয়মিত গোসল করা, সঠিকভাবে স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার করা, সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদি খুবই জরুরী।

(ছ) সোডা-পানি পান করা : এক গ্লাস পানিতে এক চামচ বেকিং সোডা মিশিয়ে সপ্তাহে এক দিন সকাল বেলা পান করলে প্রস্রাবের জ্বালাপোড়া কমবে ।

(জ) শসা খাওয়া : শসাতে প্রচুর পানি আছে। প্রতিদিন কমপক্ষে একটি শসা স্লাইস করে খেতে পারেন।

(ঝ) গরম সেঁক নেওয়া : হট ওয়াটার ব্যাগে গরম পানি নিয়ে আপনার তলপেটের উপর রাখুন, এতে খুব দ্রুত প্রস্রাবের জ্বালাপোড়া ও ব্যথা দূর হবে।

(ঞ) প্রোবায়োটিকসমৃদ্ধ খাবার খাওয়া : প্রোবায়োটিকসমৃদ্ধ খাবার খেলে এটার উপশম হয়। যেমন— টকদই, কিমচি, আচার ইত্যাদি।

(ট) মধুমিশ্রিত লেবুপানি পান করা : কুসুম গরম পানিতে একটা লেবুর রস ও এক চা চামচ মধু মিশিয়ে প্রতিদিন সকালে খালি পেটে খেতে পারেন। মধুমিশ্রিত লেবুপানি প্রস্রাবের জ্বালাপোড়া কমাতে একটি জনপ্রিয় ঘরোয়া চিকিৎসা।

পরিশেষে বলা যায়, এই রোগ এখন অনেকের হচ্ছে। আমরা একটু সচেতন হলেই এসব অসুখ-বিসুখ থেকে রক্ষা পেতে পারি। স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন, পুষ্টিকর খাবার খাওয়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার মাধ্যমে আমরা অনেক রোগবালাই থেকে মুক্ত থাকতে পারি, সেজন্য চাই শুধু একটু সদিচ্ছার প্রয়োজন।

মৌচাক মধু
দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন-০১৭৮২-৪৬৪০৯৮
মৌচাক মধু কালোজিরা ও জয়তুন তেল পাইকারী বিক্রয় করা হয়।
মৌচাক মধু কালোজিরার তেল ১০০% খাঁটি ১০০% গ্যারেন্টি ভেজাল প্রমানে দশ হাজার টাকা পুরস্কার

বি.এস.টি.আই অনুমোদিত
BSTI
লাইসেন্স নং রাজশাহী-৫৫১৮
যোগাযোগ
প্রত্যাশা লাইফ এন্টারপ্রাইজ
শালবাগান, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮
প্রত্যাশা এন্টারপ্রাইজ
প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ
মোবাইল : ০১৭১৪-৯২৯৯৭৭
দেশের প্রতিটি জেলা, উপজেলাও বিভাগীয় শহরে ডিলারশীপ দেওয়া হচ্ছে।

কুরবানী

-আবদুল লতিফ
হোমনা, কুমিল্লা।

সবার চেয়ে সেরা পশু
সবচে বেশি দাম,
কিনতে হবে এমন পশু
দেশজোড়া যার নাম!
যেই পশুটি দেখতে হবে
হাজার মানুষ জড়ো,
পত্রিকাতে ছাপবে খবর
বিশাল বড়ো বড়ো!
লোক দেখানো এমন পশু
চায় না মহান প্রভু,
আমরা মুসলিম এ কথাটি
মনে কি রাখি কভু!
মহান রবের হুকুম মোরা
ভুলে কি গেছি আজ,
মানুষের মন খুশি করতে
করি আল্লাহর কাজ!
যথা নিয়মে সঠিক নিয়্যতে
যদি কুরবানী হয়,
পশুর রক্ত মাটিতে পড়ার
আগেই কবুল হয়।

আরাফার দিন

-সাদিয়া আফরোজ
শিক্ষার্থী, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

আরাফার ঐ ময়দান জুড়ে
কাঁদছে লাখো হাজী,
লাব্বাইক আল্লাহুম্মা
বলতে আমি রাজি।
দুনিয়ার এই লেবাস খুলে
হাজীর ঐ বেশ ধরে,
ছাফা-মারওয়া তাওয়াফ করি
আল্লাহ নামটি করে।
আরাফার দিন আকাশ-বাতাস
মধুর হয়ে উঠে,
হাজীরা সব আল্লাহ নামে
নতুন কলি ফুটে।
পাপ মুছে সব জন্ম নেয় ভাই
নিষ্পাপ শিশুর মতো,
আল্লাহর রহম পেয়ে সবাই
ভুলে যায় সব ক্ষত।

মধুমাসে

-জিশান মাহমুদ
শ্রীবরদী, শেরপুর।

মধুমাসে নানা ফলে
মউ মউ ঘ্রাণ,
কাঁঠালের সুবাসেতে
ভরে উঠে প্রাণ।
আম জাম লিচু নিয়ে
মধুমাস আসে,
প্রভুর নেয়ামতে
গাছগুলো হাসে।
বাজারেতে আসি শুধু
পাকা ফল পেতে,
টসটসে আনারস
ভালোবাসি খেতে।
টকটকে লাল লিচু
গাছে গাছে ঝুলে,
জামরুলে মন ভরি
খেলাধুলা ভুলে।

কুরবানী দাও

-মো. জোবাইদুল ইসলাম
মিরসরাই, চট্টগ্রাম।

মনের সকল রেষারেষি
দাও ছেড়ে দাও আজ,
রবের তরে কুরবানী দাও
খালেছ নিয়্যত সাজ।
মনের পশু কুরবানী দাও
মহান রবের তরে,
কবুল হলে রহম দিয়ে
ঘরটা যাবে ভরে।
খুশী মনে নিজে খাও আর
বিলাও সবার মাঝে,
সবার ঘরে গোশত-রুটি
সবাই খুশির সাজে।
গরীব-দুখীর মুখে ফুটুক
মিষ্টি মধুর হাসি,
দাও ছড়িয়ে সবার মাঝে
ভালোবাসা আর খুশি।

বাংলাদেশ সংবাদ

স্কুলে ভর্তির আগেই স্মার্টফোনে আসক্ত ৮৬ শতাংশ শিশু

বাংলাদেশের ৮৬ শতাংশ প্রি-স্কুল শিশু স্মার্টফোনে আসক্ত। এর মধ্যে ২৯ শতাংশ শিশুর মারাত্মকভাবে স্মার্টফোনের আসক্তি রয়েছে। কিন্তু প্রতি ১০ জন মায়ের মধ্যে ৪ জনই তার বাচ্চার স্মার্টফোনের আসক্তি সম্পর্কে অবগত নন। বাবা-মা সন্তানদের সময় কম দেওয়ার কারণে ৮৫ শতাংশ শিশু স্মার্টফোন আসক্তিতে ভুগছে। সম্প্রতি তিন থেকে পাঁচ বছরের ৪০০ প্রি-স্কুল শিশুর ওপর পরিচালিত এক গবেষণায় এমন তথ্য উঠে এসেছে। গবেষণায় দেখা গেছে, এছাড়াও খেলার মাঠের অভাবে ৫২ শতাংশ ও খেলার সাথীর অভাবে ৪২ শতাংশ শিশু স্মার্টফোনের দিকে আসক্ত হচ্ছে। ৭৯ শতাংশ প্রি-স্কুল শিশু কার্টুন বা কল্পকাহিনী দেখার জন্য, ৪৭ শতাংশ গেম খেলার জন্য, ৪৫ শতাংশ শিশু টেলিভিশন/ভিডিও দেখা বা গান শোনার জন্য স্মার্টফোন ব্যবহার করে। অন্যদিকে শুধু ১৪ শতাংশ শিশু অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে স্মার্টফোন ব্যবহার করে। গবেষণায় আরও দেখা গেছে, নির্বাচিত ৪০০ শিশুর প্রত্যেকে স্মার্টফোন ব্যবহার করে, যাদের মধ্যে ৯২ শতাংশ তাদের বাবা-মায়ের স্মার্টফোন ব্যবহার করে এবং ৮ শতাংশ শিশুর ব্যবহারের জন্য পৃথক স্মার্টফোন আছে। অন্য এক জরিপে দেখা যায়, বাংলাদেশের শিশুরা প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৩ ঘণ্টা স্মার্টফোন ব্যবহার করে, যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কর্তৃক সুপারিশকৃত সর্বোচ্চ সময়ের প্রায় ৩ গুণ। অবিভাবকরা কেন সন্তানদের স্মার্টফোন ব্যবহার করতে দেন এই প্রশ্নের জবাবে, ৭৩ শতাংশ মা বলেছেন, তারা তাদের বাচ্চাদের স্মার্টফোনের সাথে ব্যস্ত রাখতে চান, যাতে তারা তাদের কাজ বিনা বাধায় করতে পারেন। ৭০ শতাংশ মা তাদের বাচ্চাদের স্মার্টফোন দেন কারণ তাদের বাচ্চারা স্মার্টফোন ব্যবহার করতে পছন্দ করে। ৬৭ শতাংশ মা তাদের সন্তানকে খাওয়ানোর জন্য এবং ৩১ শতাংশ মা শিশুকে ঘুম পারানোর জন্য স্মার্টফোন ব্যবহার করেন। গকেষকরা মনে করছেন, স্মার্টফোনের আসক্তি বাচ্চাদের বিভিন্ন মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ। যেমন ঘনঘন মেজাজ পরিবর্তন, কারণ ছাড়াই রেগে যাওয়া, অপর্যাপ্ত এবং অনিয়মিত ঘুম, অমনযোগিতা, ভুলে যাওয়া, ভাষার দক্ষতা বিকাশ না হওয়া এবং পিতামাতা ও খেলার সাথীদের সাথে বিচ্ছিন্নতা। স্মার্টফোনে আসক্ত বাচ্চারা স্মার্টফোনে আসক্ত নয় এমন বাচ্চাদের তুলনায় ৫০০ গুণ বেশি মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকিতে আছে।

ধূমপানের হারে বিশ্বে ৮ম বাংলাদেশ

ধূমপায়ী জনসংখ্যার হারের দিক থেকে বিশ্বে অষ্টম বাংলাদেশ। দেশের ৩৯ শতাংশ জনগোষ্ঠীই ধূমপায়ী। ৫২ শতাংশ ধূমপায়ী নিয়ে এ তালিকায় শীর্ষে রয়েছে বিশ্বের অন্যতম ক্ষুদ্র দেশ নাউরু। ওয়ার্ল্ড পপুলেশন রিভিউ (WPR)-এর তথ্য বলছে, ধূমপায়ী জনগোষ্ঠীর হারে নাউরুর পরই রয়েছে কিরিবাতি (৫২ শতাংশ)। ৪৮ শতাংশ ধূমপায়ী নিয়ে তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছে টুভ্যালু। শীর্ষ দশে বাংলাদেশের আগে থাকা দেশগুলো হলো যথাক্রমে মিয়ানমার (৪৫ শতাংশ), চিলি (৪৩ শতাংশ), লেবানন (৪২ শতাংশ) এবং সার্বিয়া (৪০ শতাংশ)। শীর্ষ ১০ দেশের তালিকায় বাংলাদেশের পরের স্থানে রয়েছে গ্রিস (৩৯ শতাংশ) এবং বুলগেরিয়া (৩৮ শতাংশ)। ওয়ার্ল্ড পপুলেশন রিভিউ বলছে, সার্বিকভাবে ধূমপায়ীর হার বেশি পাওয়া গেছে এশিয়া ও ইউরোপের বলকান অঞ্চলে। পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলোতে এই হার সবচেয়ে কম। এদিকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পুরুষদের মধ্যে ধূমপায়ীদের হার অনেক বেশি। সে তুলনায় নারীদের মধ্যে এই হার নগণ্য।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

পাঁচ বছরে বিলুপ্ত হবে ৮ কোটি ৩০ লাখ চাকরির পদ

অর্থনীতিতে ধীরগতি, কোম্পানিগুলোর প্রযুক্তি নির্ভরতা বৃদ্ধিসহ নানা কারণে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে বড় তোলপাড় ঘটতে চলেছে বৈশ্বিক চাকরির বাজারে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (WEF) অনুসন্ধান বলছে, ২০২৭ সালের মধ্যে চাকরি বাজারে নতুন ৬ কোটি ৯০ লাখ পদ সৃষ্টি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। একই সময়ে বিলুপ্ত হবে ৮ কোটি ৩০ লাখ পদের চাকরি। এর ফলে নিট ১ কোটি ৪০ লাখ চাকরি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, যা বর্তমান কর্মসংস্থানের দুই শতাংশের সমান। বিশ্বব্যাপী আট শতাধিক কোম্পানির ওপর জরিপ চালিয়ে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে বৈশ্বিক সংস্থাটি। ডব্লিউইএফ বলছে, আগামী পাঁচ বছরে বিভিন্ন কারণে শ্রমবাজারে তোলপাড় ঘটতে চলেছে। নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির পেছনে শক্তিশালী ইঞ্জিন হিসেবে কাজ করবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবস্থায় স্থানান্তর। তবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধীরগতি ও উচ্চ মূল্যস্ফীতি চাকরিতে লোকসানের কারণ হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) ব্যবহার ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় পথেই প্রভাব ফেলবে। কিছু ক্ষেত্রে মানুষের জায়গা নিয়ে নেবে রোবট।

জাপানে দ্রুত বাড়ছে মুসলিমদের সংখ্যা

জাপানে বেশিরভাগ মুসলিম তিনটি মেট্রোপলিটন এলাকায় বাস করে। যেমন গ্রেটার টোকিও এরিয়া, চুকিপ মেট্রোপলিটন এরিয়া এবং কিনকি অঞ্চলে। সমগ্র জাপানে মুসলিমদের নেটওয়ার্ক এখনও খুবই সীমিত। এশিয়ার দেশ জাপানে মুসলিমদের সংখ্যা তুলনায় অনেক কম। তবে গত কয়েক বছর ধরে দেশটিতে ইসলাম ধর্মের মানুষের সংখ্যা দ্রুত গতিতে বাড়ছে। এদের মধ্যে যেমন বিভিন্ন দেশ থেকে যাওয়া মুসলিমরা রয়েছেন, তেমন জাপানিরাও ইসলামের প্রতি আগ্রহী হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছেন। দ্য ইকোনোমিস্ট এর প্রতিবেদনে বলা হয়, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জাপানে মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। জাপানে বসবাসকারী মুসলিমদের সংখ্যা এক দশকে দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে। ২০১০ সালে এই সংখ্যা ছিল ১ লাখ ১০ হাজার। ২০১৯ সালে সেটি বেড়ে হয় ২ লাখ ৩০ হাজার। এদের মধ্যে অন্তত ৫০ হাজার জাপানি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। জাপানে ১১০টিরও বেশি মসজিদ রয়েছে। ২০০১ সালে দেশটিতে মাত্র ২৪টি মসজিদ ছিল। জাপানে মুসলিম জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির পেছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে। প্রথমত, জাপানে প্রায় অর্ধেক সেটেলড মুসলিম বিবাহিত। এটি ইঙ্গিত করে যে জাপানে ভবিষ্যতে আরও দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রজন্মের মুসলিম থাকবে। মুসলিমদের এই নতুন প্রজন্ম বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পটভূমিতে উন্মোচিত হবে এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী জাপানি সমাজের সেতুবন্ধনের চাবিকাঠি হবে। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। জাপানে মুসলিম জনসংখ্যা কেন্দ্রীভূত হওয়ার দ্বিতীয় বড় কারণ হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। ইরান, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ প্রভৃতি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ থেকে মানুষ কাজের উদ্দেশ্যে জাপানে যায়।

মুসলিম বিশ্ব

৩ মাস অনশনের পর ইসরাঈলী কারাগারে মারা গেলেন ফিলিস্তীনী নেতা খাদের আদনান

ইসলামিক জিহাদের প্রাক্তন মুখপাত্র খাদের আদনান, যিনি ইসরাঈলের অবৈধ আটক নীতির বিরুদ্ধে ফিলিস্তীনী প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন, ৮৭ দিন অনশনের পর তিনি মারা গেছেন। ইসরাঈলী প্রিজন সার্ভিস তার মৃত্যু ঘোষণা করে এক বিবৃতিতে জানায়, ৪৫ বছর বয়সী আদনান গত ৫ ফেব্রুয়ারি গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকে অনশনরত অবস্থায় ছিলেন। বন্দী থাকাকালীন তিনি মেডিকেল পরীক্ষা করাতেও অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। প্রায় ৩ মাসের অনশনের পর তাকে নিজ কক্ষে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। আদনান এর আগে ২০১২ সালে ৬৬ দিন অনশন চালানোর পর আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, যা সে সময়ে ইসরাঈলী কারাগারে একজন ফিলিস্তীনী বন্দীর দীর্ঘতম অনশন ছিল। ফিলিস্তীনী প্রিজনার্স সোসাইটির তথ্য অনুসারে, ২০০৪ সাল থেকে তিনি কমপক্ষে ১১ বার গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং এর মধ্যে পাঁচবারই তিনি অনশন করেছেন। ২০১৫ সালে ইসরাঈলী কর্তৃপক্ষ তাকে মুক্তি দেওয়ার আগে তিনি ৫৫ দিনের জন্য অনশন করেছিলেন। আদনান মোট আট বছর ইসরাঈলী কারাগারে কাটিয়েছেন, যার বেশিরভাগই প্রশাসনিক বন্দিত্বের অধীনে। বর্তমানে ইসরাঈলের কারাগারে ৪৯০০ জন ফিলিস্তীনী বন্দী রয়েছেন, যার মধ্যে ১০০০ জনকে কোনো অভিযোগ ছাড়াই প্রশাসনিক বন্দিত্বের মাধ্যমে আটকে রাখা হয়েছে। ফিলিস্তীনী প্রিজনার্স সোসাইটির তথ্য মতে, ২০০৩ সালের পর থেকে এটি সর্বোচ্চ সংখ্যা।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

চীনে সুপার কাউ ক্লোন, বছরে দুধ দেবে ১৮ হাজার লিটার

তিনটি 'সুপার কাউ' ক্লোন করতে সক্ষম হয়েছেন চীনা বিজ্ঞানীরা। এসব গরু বছরে অন্তত ১৮ হাজার লিটার এবং পুরো জীবদ্দশায় অন্তত ১ লাখ লিটার দুধ দিতে সক্ষম। সিএনএন নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চীনের দুগ্ধজাত শিল্পের জন্য এটি এক অসাধারণ অর্জন। প্রথমে ক্লোন করা তিনটি বাছুর জন্ম নেয়। বাছুরগুলোকে নেদারল্যান্ডসের হোলস্টেইন ফ্রিজিয়ান জাতের গাভী থেকে ক্লোন করা হয়েছে। এই গুরুগুলো বছরে ১৮ হাজার লিটার এবং জীবদ্দশায় ১ লাখ লিটার দুধ দিতে পারবে। যা যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ কোনো জাতের গরুর দেওয়া দুধের পরিমাণের চেয়ে অন্তত ১ দশমিক ৭ গুণ বেশি।

সওয়াল-জওয়াব

ফাতাওয়া বোর্ড, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ

আক্বীদা

প্রশ্ন (১) : মাতুরিদী আক্বীদা সম্পর্কে জানতে চাই।

-শাহাদত
আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তর : মাতুরিদী একটি বিদআতী ফেরকা। এদেরকে আবূ মানছূর আল মাতুরিদীর দিকে সম্পৃক্ত করা হয়ে থাকে। মূলত জাহমিয়্যাহ ও মুতাযিলা ফেরকাদ্বয়ের দার্শনিক আক্বীদার বিরোধিতা করা জন্য এবং যুক্তিভিত্তিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে দ্বীনের আক্বীদা প্রতিষ্ঠা করার জন্যই এই ফেরকার উৎপত্তি। এদের আক্বীদার সাথে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আক্বীদার অনেক পার্থক্য রয়েছে। মাতুরিদীদের নিকটে ঈমান হলো, শুধু অন্তরের বিশ্বাসের নাম, আর এরা বিশ্বাস করে যে, ঈমানের কোনো কম বেশি হয় না। অথচ আহলুস সুন্নাহ বিশ্বাস করে যে, ঈমান হলো, অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও অঙ্গ-প্রতঙ্গ দিয়ে আমল করার নাম। আর ঈমানের কম বেশি হয় (আল-ফাতহ, ৪৮/৪; আল-আনফাল, ৮/২; মুহাম্মাদ, ৪৭/১৭)। সকলের ঈমান সমান নয়। তারা আল্লাহর আরশে সমুন্নত হওয়াকে যুক্তি দিয়ে অস্বীকার করে, অথচ আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে অনেক আয়াতে বলেছেন যে, তিনি আরশের ওপরে (আল-আ‘রাফ, ৭/৫৪; ত্ব-হা, ২০/৫)। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত কোনো ধরনের ব্যাখ্যা ছাড়াই তারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তাআলা আরশের ওপরে সমুন্নত। আবার তারা আল্লাহ তাআলা কথা বলাকে অস্বীকার করে এবং এর পেছনে বিভিন্ন ধরনের যুক্তি দাঁড় করায়। অথচ আল্লাহ তাআলা তার কথা বলার বিষয়টি পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন (আন-নিসা, ৪/১৬৪)। এছাড়াও তাদের অনেক ভ্রান্ত আক্বীদা রয়েছে।

প্রশ্ন (২) : মুমিনগণ জান্নাতে আল্লাহকে দেখতে পাবে কি?

-শামীম রেজা
ময়মনসিংহ।

উত্তর : হ্যাঁ, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত বিশ্বাস করে যে, মুমিনগণ জান্নাতে আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখতে পাবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘সেদিন কতক মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল, তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে’ (আল-ক্বিয়ামাহ, ৭৫/২২-২৩)। আর আল্লাহর দর্শনই হচ্ছে তাদের জন্য সবচেয়ে বড় নে‘মত। ছুহায়ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘জান্নাতবাসীগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন, তোমরা কি আরও কিছু চাও, যা আমি তোমাদেরকে অতিরিক্ত প্রদান করব? তারা বলবে, আপনি কি আমাদের মুখগুলিকে উজ্জ্বল করেননি? আপনি কি আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাননি এবং আপনি কি আমাদেরকে জাহান্নাম হতে মুক্তি দেননি? আপনার এত বড় বড় নে‘মতের পর আর কী অবশিষ্ট আছে, যা আমরা চাইব? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁর ও জান্নাতীদের মধ্যে হতে হিজাব বা পর্দা তুলে ফেলা হবে, ফলে তারা আল্লাহ তাআলার দীদার বা দর্শন লাভ করবে। তখন তারা বুঝতে পারবে বস্তুত, আল্লাহ তাআলার দর্শনলাভ ও তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকা অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় কোনো বস্তুই এ যাবৎ তাদেরকে প্রদান করা হয়নি’ (ছহীহ মুসলিম, হা/১৮১)।

শিরক

প্রশ্ন (৩) : ছোট বাচ্চারা যেহেতু কোনো দু‘আ বা সূরা পড়তে পারে না সেহেতু তাদের গলায় সূরা নাস, ফালাক্ব ইত্যাদি তাবীয করে ঝুলানো যাবে কি?

-রুবেল ইসলাম
দিনাজপুর।

উত্তর : না, যাবে না। কেননা যে কোনো ধরনের তাবীয ঝুলানো শিরক। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘যে ব্যক্তি তাবীয লটকালো সে শিরক করল’ (মুসনাদে আহমাদ, হা/১৭৮৮৪)। অপর বর্ণনায় তিনি বলেন, ‘যে ব্যক্তি কোনো রক্ষাকবচ ধারণ করবে, তাকে ঐ জিনিসের কাছে সোপর্দ করা হবে’

(আবূ দাঊদ, হা/২০৭২)। এ অবস্থায় অন্যরা নাস-ফালাক্ব পড়ে বাচ্চার গায়ে ফুঁক দিবে।

প্রশ্ন (৪) : আমি একটি সরকারী স্কুলে শিক্ষকতা করি। আমাদের মতো শিক্ষকদেরকে বাধ্যগতভাবে বিভিন্ন দিবস উদযাপন করতে হয়। এখন আমার প্রশ্ন হলো, জেনে শুনে চাকরির জন্য এমন দিবস পালন করা জায়েয কি?

-ইজাজুল
যশোর।

উত্তর : ইসলামে এমন দিবস পালন করা জায়েয নয়। বরং এগুলো হলো বিজাতীয় কুসংস্কার, যা ইসলামে নিষিদ্ধ। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে' (আবূ দাঊদ, হা/৪০৩১; ছহীহুল জামে, হা/৬১৪৯)। সুতরাং অবশ্যই এই দিবস পালন করা বর্জন করতে হবে। প্রয়োজনে রিযিকের অন্য পথ তালাশ করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ তার উত্তরণের পথ বের করে দেন। আর তাকে ধারণাতীত স্থান থেকে রিযিক দান করেন' (আত-তালাক, ৬৫/২-৩)। সুতরাং আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে এই ধরনের দিবস পালন করা থেকে দূরে থাকতে হবে।

পবিত্রতা

প্রশ্ন (৫) : ওযূ ছাড়া কুরআন তেলাওয়াত করা যাবে কি? দয়া করে জানাবেন।

-মোহাম্মদ ইউনুছ
ঢাকা।

উত্তর : হ্যাঁ, ছোট নাপাকী অবস্থাতে কুরআন তেলাওয়াত করা যাবে। আর এই বিষয়ে আলেমগণের মাঝে কোনো মতভেদ নেই। তবে উত্তম হলো, পবিত্র অবস্থাতেই কুরআন পাঠ করা (আল-মাজমূ, ২/১৬৩)। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্বাবস্থায়ই আল্লাহর যিকির করতেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৩৭৩)। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি আমার খালা মাইমূনা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা -এর কাছে রাত কাটিয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিবারবর্গের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করে শুয়ে পড়লেন। তারপর রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে তিনি উঠলেন এবং আসমানের দিকে তাকিয়ে পাঠ করলেন- إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيَاتٍ لِأُوْلِي الْأَلْبَابِ এরপর দাঁড়ালেন এবং ওযূ করে মিসওয়াক করে এগারো রাকআত ছালাত আদায় করলেন (ছহীহ বুখারী, হা/৪৫৬৯)। অত্র হাদীছে ঘুম থেকে উঠে ওযূ করার পূর্বেই রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করা প্রমাণ করে যে, ওযূ ছাড়া কুরআন পড়া যায়।

প্রশ্ন (৬) : রাতে স্ত্রী সহবাস করার পরে ওযূ করে যদি ঘুমাতে চাই, তাহলে এমন অপবিত্র অবস্থাতে কি ঘুমের দু'আসমূহ পাঠ করতে পারব?

-মামুনুর রশীদ
রংপুর।

উত্তর : হ্যাঁ, এমন অবস্থাতে ঘুমের দু'আসমূহ পাঠ করাতে কোনো বাধা নেই। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্বদাই আল্লাহর যিকির করতেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৩৭৩)।

ছালাত

প্রশ্ন (৭) : ছালাতে যদি দুনিয়াবী চিন্তা ভাবনা আসে তাহলে কি ছালাত হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
বগুড়া।

উত্তর : ছালাত হয়ে যাবে। কিন্তু নেকীর ক্ষেত্রে ঘাটতি হবে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'এমন লোকও আছে (যারা ছালাত আদায় করা সত্ত্বেও ছালাতের রুকন ও শর্তগুলো সঠিকভাবে আদায় না করায় এবং ছালাতে পরিপূর্ণ একাগ্রতা ও খুশূ খুযূ না থাকায় তারা ছালাতের পরিপূর্ণ ছওয়াব পায় না)। বরং তারা দশ ভাগের এক ভাগ, নয় ভাগের এক ভাগ, আট ভাগের এক ভাগ, সাত ভাগের এক ভাগ, ছয় ভাগের এক ভাগ, পাঁচ ভাগের এক ভাগ, চার ভাগের এক ভাগ, তিন ভাগের এক ভাগ বা অর্ধাংশ ছওয়াব প্রাপ্ত হয়' (আবূ দাঊদ,

হা/৭৯৬)। এতে বুঝা যায় যে, ছালাত আদায়ে খুশূ খুযূ অনুযায়ী নেকিরও তারতম্য হয়ে থাকে।

প্রশ্ন (৮) : যদি সিজারের মাধ্যমে কোনো মহিলার বাচ্চা হয় তাহলে ঐ মহিলাকে ছালাত আদায় করতে হবে, কিন্তু নরমালে বাচ্চা হলে ছালাত আদায় করতে হবে না বলে জনৈক আলেম ফতোয়া দিয়েছেন। উনার ফতোয়া কি ঠিক আছে? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

- রবিউল ইসলাম
পীরগঞ্জ, রংপুর।

উত্তর : না, উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা সিজারের মাধ্যমে বাচ্চা হলেও সেই মহিলার নিফাসের রক্ত বের হয়। আর যার নিফাস হয় সেই মহিলার জন্য ছালাত আদায় করা জায়েয নয়। উম্মু সালামাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর যুগে নিফাসগ্রস্তা মহিলারা চল্লিশ দিন (ছালাত ছিয়াম আদায় না করেই) বসে থাকত (তিরমিযী, হা/১৩৯)। ইমাম তিরমিযী রহিমাহুল্লাহ বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর ছাহাবা, তাবিঈন ও তাদের পরবর্তীদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই যে, নিফাসগ্রস্তা মহিলারা চল্লিশ দিন পর্যন্ত ছালাত আদায় করবে না। হ্যাঁ, যদি চল্লিশ দিনের পূর্বে পবিত্র হয়ে যায় তবে গোসল করে ছালাত শুরু করে দেবে (তিরমিযী, ১/২৫৬)। সুতরাং সিজারের মাধ্যমে বাচ্চা হলেও সেই মহিলাকে ছালাত আদায় করা হতে বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন (৯) : বিতর ছালাতে দু'আ কুনূতের পরে অন্যান্য দু'আ করা যাবে কি?

-মো. আব্দুস সামাদ
দিনাজপুর।

উত্তর : কুনূতে রাতেবাতে দু'আ কুনূত ছাড়া আর কোনো দুআ পড়া যাবে না। বরং শুধু দু'আ কুনূতই পড়তে হবে। তবে কুনূতে নাযেলা হলে অন্যান্য দু'আগুলোও পড়া যাবে (ছহীহ বুখারী, হা/৮০৪; ছহীহ মুসলিম, হা/৬৭৫)।

প্রশ্ন (১০) : ছালাতে দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকে ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা কি সুন্নাত?

-রাফিদ
ঢাকা।

উত্তর : শুধু তাশাহহুদের বৈঠকেই শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছালাত আদায়ের সময় যখন বৈঠকে বসতেন, তখন তিনি তার দুহাত দুই হাঁটুর উপর রাখতেন। আর ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির পার্শ্ববর্তী (শাহাদাত) আঙ্গুল উঠিয়ে ইশারা করতেন এবং বাম হাত বাম হাঁটুর উপর ছড়িয়ে রাখতেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৫৮০)। তাশাহহুদের বৈঠক ছাড়া অন্য কোথাও শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করতে হবে না (মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ আল কুয়েতিয়্যাহ, ১৫/২৬৬)। সুতরাং দুই সিজদার মাঝে শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করা যাবে না।

প্রশ্ন (১১) : জামাআতে শামিল হওয়ার জন্য দ্রুত পায়ে হেঁটে যাওয়ার বিধান কী?

-মেহেদী হাসান
নাটোর।

উত্তর : জামাআতে শামিল হওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করে যাওয়া যাবে না। বরং স্বাভাবিক গতিতে গিয়ে জামাআতে শরীক হতে হবে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যখন ছালাতের ইক্বামত দেওয়া হবে তখন তোমরা তাড়াহুড়া করে ছালাতে এসো না। বরং তোমরা হেঁটে শান্তভাবে এসো। অতঃপর ছালাতের যে অংশটুকু পাও তা আদায় করো এবং যে অংশটুকু ছুটে যায় তা পূর্ণ করো' (ছহীহ বুখারী, হা/৯০৮; ছহীহ মুসলিম, হা/৬০২)।

প্রশ্ন (১২) : মসজিদে মুছল্লীদের সামনের দিকে কি ঘড়ি বা দু'আর চার্ট ইত্যাদি টাঙানো যাবে?

-জাহিদুল ইসলাম
ঢাকা।

উত্তর : ছালাতে মনোযোগের বিঘ্ন ঘটে এমন কোনো কিছুই মুছল্লীর সামনের দিকে রাখা ঠিক নয়। আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে

বর্ণিত, আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর নিকট একটি বিচিত্র রঙের কাপড় ছিল। তিনি তা ঘরের এক দিকে পর্দা হিসাবে ব্যবহার করছিলেন। নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘আমার সামনে থেকে তোমার এই পর্দা দূর করো। কারণ ছালাত আদায়ের সময় বারবার এর নকশাগুলো বা ছবিগুলো আমার সামনে ভেসে ওঠে’ (ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৫৯)। এই হাদীছ প্রমাণ করে যে, ছালাতে মনোযোগের বিঘ্ন ঘটে এমন কোনো কিছুই মুছল্লীর সামনের দিকে রাখা যাবে না। সুতরাং চেষ্টা করতে হবে মসজিদের সামনের দেয়াল সকল কিছু থেকে মুক্ত রাখা। যা কিছু প্রয়োজন তা আশেপাশের দেয়ালে অথবা পিছনের দেয়ালে লাগানো।

প্রশ্ন (১৩) : মহিলাদের ঈদগাহে ছালাত আদায় করার পরিবেশ না থাকলে ঈদের ছালাত কীভাবে আদায় করবে?

-মুছলেহুদ্দীন
রাজশাহী।

উত্তর : মহিলাদের জন্য সুন্নাত হলো, ঈদের দিনে পুরুষ ইমামের ইমামতিতে ঈদগাহেই ছালাত আদায় করা। উম্মু আতিয়াহ রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদেরকে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আদেশ করেছেন, আমরা যেন পরিণত বয়স্কা মেয়েদেরকে ও পর্দানশীন মেয়েদেরকে ঈদের ছালাতে যাওয়ার জন্য বলি এবং তিনি ঋতুবতী নারীদেরকে আদেশ করেছেন তারা যেন মুসলিমদের ছালাতের স্থান থেকে কিছুটা পৃথক থাকে (ছহীহ বুখারী, হা/৩২৪; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৯০)। কিন্তু কোনো বাড়িতে বা কোনো স্থানে শুধু মহিলারা তাদের একজনকে ইমাম বানিয়ে ছালাত আদায় করা শরীআতসম্মত নয়। বরং বিদআত বলে গণ্য হবে। (ফাতওয়া নূরুন আলাদ দারব ইবনু উছাইমীন, ৮/২)।

যাকাত

প্রশ্ন (১৪) : আটা দিয়ে ফিতরা আদায় হবে কি?

-মুছলেহুদ্দীন বিন সিরাজুল ইসলাম
তানোর, রাজশাহী।

উত্তর : হ্যাঁ, আটা দিয়ে ফিতরা আদায় করা যাবে। কেননা আটা শস্যদানারই অংশ, যেটিকে মাপা যায় এবং সংরক্ষণও করা যায় (মাজমূ ফাতাওয়া ইবনু তায়মিয়্যাহ, ২৫/৬৯; আল মুগনী, ৪/২৮৯-২৯০)। আর আটা খাদ্যদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত। আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ঈদের দিন এক সা পরিমাণ খাদ্য ছাদাকাতুল ফিতর হিসেবে আদায় করতাম। আবূ সাঈদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমাদের খাদ্যদ্রব্য ছিল যব, কিসমিস, পনির ও খেজুর (ছহীহ বুখারী, হা/১৫১০)।

হজ্জ

প্রশ্ন (১৫) : হজ্জের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে জানতে চাই?

-ইদ্রিস আলী
টাঙ্গাইল।

উত্তর : হজ্জ হলো ইসলামের একটি অন্যতম রুকন। যে ব্যক্তি হজ্জ করার সামর্থ্য রাখে তার জন্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ করা ফরয (আলে ইমরান, ৩/৯৭)। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটি- ১. আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোনো উপাস্য নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা। ২. ছালাত কায়েম করা। ৩. যাকাত আদায় করা। ৪. রামাযানের ছিয়াম পালন করা এবং ৫. হজ্জ সম্পাদন করা (ছহীহ বুখারী, হা/৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬)। হজ্জের অনেক ফযীলত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘এক উমরা থেকে আরেক উমরা উভয়ের মধ্যবর্তী গুনাহের জন্য কাফফারাস্বরূপ। আর জান্নাতই হলো কবুল হজ্জের প্রতিদান’ (ছহীহ বুখারী, হা/১৭৭৩; ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৪৯)। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, ‘তোমরা হজ্জ ও উমরা পরপর করতে থাক। কেননা হাপরের আগুন যেমনভাবে লোহা ও সোনা-রূপার ময়লা দূর করে, তেমনভাবে হজ্জ ও উমরা দারিদ্র্য ও গুনাহকে দূর করে দেয়। আর জান্নাতই হলো কবুল হজ্জের প্রতিদান’ (তিরমিযী, হা/৮১০; ইবনু খুযাইমাহ, হা/২৫১২)। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি

আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ করল এবং অশালীন কথাবার্তা ও গুনাহ হতে বিরত থাকল, সে ঐ দিনের মতো নিষ্পাপ হয়ে হজ্জ হতে ফিরে আসবে যেদিন তাকে তার মা জন্ম দিয়েছিল' (ছহীহ বুখারী, হা/১৫২১; ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৫০)।

প্রশ্ন (১৬) : হজ্জের প্রকারগুলোর মধ্যে কোন প্রকার হজ্জ বেশি উত্তম?

-আব্দুর রহমান
নরসিংদী।

উত্তর : হজ্জের প্রকারগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম হলো তামাত্তু হজ্জ। সেটি হলো হজ্জ পালনকারী হজ্জের মাসগুলোতে উমরা এর ইহরাম বেঁধে মক্কাতে প্রবেশ করবে এবং উমরা পুরা করে ইহরাম থেকে হালাল হবে। তারপর হজ্জ করা পর্যন্ত হালাল অবস্থাতেই থাকবে। আর তার পক্ষে যেমন কুরবানী করা সম্ভব তেমন তাকে কুরবানী করতে হবে। জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে হজ্জের ইহরাম বাঁধলাম। আমরা মক্কাতে পৌঁছলে তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হালাল হওয়ার এবং এ ইহরামকে উমরার ইহরামে পরিবর্তন করার নির্দেশ দিলেন। আমাদের জন্য তার এ নির্দেশ কঠোর মনে হলো এবং আমাদের মনোকষ্ট হলো। এ খবর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পৌছল। আমাদের জানা নেই যে, তিনি কি অহীর মাধ্যমে এ খবর পেয়েছেন, না কেউ তার কাছে এ কথা পৌঁছিয়েছে? তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হে জনগণ! তোমরা ইহরাম থেকে হালাল হও। আমার সাথে কুরবানীর পশু না থাকলে আমিও তোমাদের অনুরূপ করতাম'। জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তারপর আমরা ইহরামমুক্ত হলাম, এমনকি স্ত্রী সঙ্গম এবং স্বাভাবিক অবস্থায় সাধারণত যা করা হয়, তাই করলাম। অতঃপর তালবিয়ার দিন (৮ যিলহজ্জ) আমরা (মিনা ও আরাফার উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্য) মক্কা ত্যাগ করলাম এবং হজ্জের ইহরাম বাঁধলাম (ছহীহ বুখারী, হা/১৫৬৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১২১৬)।

প্রশ্ন (১৭) : বছরের কোন সময়ে উমরা করা বেশি উত্তম?

-কামরুল হাসান
চট্টগাম।

উত্তর : বছরের যেকোনো সময়েই উমরা করা শরীআতসম্মত। তবে রামাযান মাসে উমরা করা বেশি উত্তম। কেননা ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'রামাযান মাসে উমরা করা একটি হজ্জের সমান' (ছহীহ বুখারী, হা/১৭৮২; ছহীহ মুসলিম, হা/১২৫৬)।

প্রশ্ন (১৮) : কেউ যদি সাবালক হওয়ার আগে হজ্জ করে, তাহলে সাবালক হওয়ার পরেও কি তাকে হজ্জ করতে হবে, নাকি আগের হজ্জেই তার জন্য যথেষ্ট হবে?

-মাসিদুল ইসলাম
চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর : কেউ সাবালক হওয়ার আগে হজ্জ করলে তার সেই হজ্জের জন্য তার পিতামাতা নেকী পাবে। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে এক মহিলা একটি শিশুকে তুলে ধরে জিজ্ঞেস করল, এর জন্য হজ্জ আছে কি? তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ, তবে তোমার জন্য প্রতিদান রয়েছে' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৩৬; আবূ দাঊদ, হা/১৭৩৬)। কিন্তু সাবালক হলে তার থেকে হজ্জের ফরযিয়্যাত মাফ হবে না। বরং তাকে আবার হজ্জ করতে হবে। কারণ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তিন ধরনের লোকের ওপর থেকে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে- (১) ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না জাগ্রত হয়, (২) অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক যতক্ষণ না সাবালগ হয়, (৩) পাগল ব্যক্তি যতক্ষণ না তার সঠিক জ্ঞান ফিরে আসে (আবূ দাঊদ, হা/৪৩৯৮; নাসাঈ, হা/৩৪৩২)।

প্রশ্ন (১৯) : কোনো ব্যক্তি ইহরাম অবস্থাতে সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে কি?

-মুরাদ হোসেন
ঢাকা।

উত্তর : ইহরামের পূর্বে শরীরে সুগন্ধি থাকলে সেই অবস্থাতে থাকা মুহরিমের জন্য জায়েয। কিন্তু ইহরামের পরে নতুনভাবে

সুগন্ধি ব্যবহার করা জায়েয নয়। ছাফওয়ান ইবনু ইয়ালা ইবনু উমাইয়া রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়ালা ইবনু উমাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতেন, হায়! রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর অহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় আমি যদি তাঁকে দেখতে পেতাম। যখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিআরানা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন এবং চাঁদোয়া দিয়ে তাঁর ওপর ছায়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং তাঁর সঙ্গে ছিলেন কতিপয় ছাহাবী, তাদের মধ্যে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু ও ছিলেন। এমন সময় জুব্বা পরিহিত ও সুগন্ধি মেখে এক ব্যক্তি এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! ঐ সম্পর্কে আপনার মত কী, যে সুগন্ধি মেখে জুব্বা পরে ইহরাম বেঁধেছে? তখন কিছু সময়ের জন্য নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা করলেন, এমন সময় তার নিকটে অহী আসল। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তার হাত দিয়ে ইয়ালা রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে ইশারা করে ডাকলেন। ইয়ালা রাযিয়াল্লাহু আনহু এলেন এবং তাঁর মাথা ঐ চাদরের ভেতর ঢোকালেন। তিনি দেখলেন যে, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখমণ্ডল রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছে এবং কিছু সময়ের জন্য বেশ জোরে জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করছেন। তারপর তাঁর থেকে এ অবস্থা সম্পূর্ণরূপে দূর হওয়ার পর তিনি বললেন, 'প্রশ্নকারী কোথায়, যে কিছুক্ষণ পূর্বে আমাকে উমরা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল? লোকটিকে খুঁজে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট নিয়ে আসা হলো। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যে সুগন্ধি তুমি তোমার শরীরে মেখেছে, তা তিনবার ধুয়ে ফেলবে আর জুব্বাটি খুলে ফেলবে। তারপর তুমি তোমার উমরাতে ঐ সমস্ত কাজ করবে, যা তুমি হজ্জের মধ্যে করে থাক' (ছহীহ বুখারী, হা/৪৯৮৫; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৮০)।

প্রশ্ন (২০) : ইহরাম অবস্থাতে মাথা মুণ্ডন করা যাবে কি?

-আযাহার আলী
নওগাঁ।

উত্তর : না, ইহরাম অবস্থাতে মাথা মুণ্ডন করা যাবে না এবং চুলও ছোট করা যাবে না। কেননা আল্লাহ তাআলা সূরা আল-বাকারাতে বলেন, 'আর তোমরা মাথা মুণ্ডন করো না যে পর্যন্ত কুরবানীর পশু তার স্থানে না পৌঁছে' (আল-বাকারা, ২/১৯৬)। তবে কোনো মুহরিম ব্যক্তি চুল রাখার কারণে যদি কষ্ট পায়, তাহলে তার জন্য চুল কাটা জায়েয। কিন্তু এই কারণে তাকে ফিদইয়া দিতে হবে। কেননা আল্লাহ তাআলা সূরা আল-বাকারাতে বলেন, 'অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অসুস্থ হয় বা মাথায় কষ্টদায়ক কিছু হয় তবে ছিয়াম কিংবা ছাদাকা অথবা পশু যবেহ দ্বারা তার ফিদইয়া দিবে (আল-বাকারা, ২/১৯৬)। কা'ব ইবনু উজরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। তখন আমার চেহারায় উকুন বেয়ে পড়ছে। তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমার কষ্ট বা পীড়া যে পর্যায়ে পৌঁছেছে দেখতে পাচ্ছি। তুমি কি একটি বকরীর ব্যবস্থা করতে পারবে? আমি বললাম, না। তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তাহলে তুমি তিন দিন ছিয়াম পালন করো অথবা ছয়জন মিসকীনকে অর্ধ সা করে খাবার খাওয়াও' (ছহীহ বুখারী, হা/১৮১৬; ছহীহ মুসলিম, হা/১২০১)।

প্রশ্ন (২১) : ইহরাম অবস্থাতে বিবাহ করা যাবে কি?

-মাহফুজুর রহমান
যশোর।

উত্তর : না, ইহরাম অবস্থাতে বিবাহ করা যাবে না, এমনকি অন্যকেও বিবাহ দেওয়া যাবে না এবং বিবাহের প্রস্তাব দেওয়াও যাবে না। উছমান ইবনু আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মুহরিম ব্যক্তি বিবাহ করবে না, অন্যকেও বিবাহ করাবে না এবং বিবাহের প্রস্তাবও দিবে না' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৪০৯; আবূ দাঊদ, হা/১৮৪১)।

উল্লেখ্য যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাইমূনা রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে ইহরাম অবস্থাতে বিবাহ করেছিলেন মর্মে যেই কথা রয়েছে তা সঠিক নয়। বরং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইহরাম থেকে মুক্ত অবস্থাতেই বিবাহ করেছিলেন (ছহীহ মুসলিম, হা/১৪১১)।

প্রশ্ন (২২) : ইহরাম অবস্থাতে কেউ যদি শিকার করে ফেলে তাহলে এক্ষেত্রে তার করণীয় কী?

-রাশেদ আল মাগমূদ
গাজীপুর।

উত্তর : ইহরাম অবস্থাতে শিকার করলে তাকে কাফফারা দিতে হবে। সেই কাফফারা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তোমাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছে করে সেটাকে হত্যা করলে যা সে হত্যা করল তার বিনিময় হচ্ছে অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু, যার ফায়ছালা করবে তোমাদের মধ্যে দুজন ন্যায়বান লোক, কা‘বাতে পাঠানো হাদী রূপে। বা সেটার কাফফারা হবে দরিদ্রকে খাদ্য দান করা কিংবা সমান সংখ্যক ছিয়াম পালন করা, যাতে সে নিজের কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। যা গত হয়েছে আল্লাহ তা ক্ষমা করেছেন। কেউ তা আবারো করলে আল্লাহ তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী’ (আল-মায়িদা, ৫/৯৫)। তথা যে প্রাণী শিকার করবে সেই প্রাণীর মতো একটি প্রাণী হাদী হিসেবে যবেহ করবে এবং গরীব মিসকীনদের মধ্যে বণ্টন করে দিবে। অথবা ওই শিকারকৃত প্রাণী যতজন মানুষ খেতে পারবে সেই সংখ্যক মিসকীন খাওয়ানোর চেষ্টা করবে। অথবা সেই পরিমাণ ছিয়াম পালন করবে।

প্রশ্ন (২৩) : হায়েয অবস্থাতে তাওয়াফ করা যাবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
রাজশাহী।

উত্তর : না, ঋতুবতী মহিলা অন্যান্য হজ্জ পালনকারীদের সাথে হজ্জের অন্যান্য কার্যাবলী করবে, কিন্তু সে ঋতু অবস্থাতে তাওয়াফ করতে পারবে না। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে হজ্জের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলাম। আমরা ‘সারিফ’ নামক স্থানে বা তার নিকটবর্তী কোনো স্থানে পৌঁছলে আমি ঋতুবতী হই। এ সময় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে আমাকে কাঁদতে দেখলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি কাঁদছ কেন? আমি বললাম, আল্লাহ্র শপথ! এ বছর হজ্জ না করাই আমার জন্য পছন্দনীয়। তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘সম্ভবত তুমি ঋতুবতী হয়েছ’। আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘এটাতো আদম কন্যাদের জন্যে আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন। তুমি পবিত্র হওয়া পর্যন্ত অন্যান্য হজ্জ পালনকারীদের মতো সমস্ত কাজ করে যাও, কেবল কা‘বার তাওয়াফ করবে না’ (ছহীহ বুখারী, হা/৩০৫; ছহীহ মুসলিম, হা/১২১১)।

প্রশ্ন (২৪) : কোন সময়ের মধ্যে আরাফাতে অবস্থান করলে তা আরাফাতে অবস্থান বলে গণ্য হবে?

-আমজাদ হোসেন
ফরিদপুর।

উত্তর : আরাফাতে অবস্থানের সময় হলো নয় তারিখ সকাল হতে সূর্য ডুবা পর্যন্ত (তিরমিযী, হা/৮৯১; আবূ দাঊদ, হা/১৯৫০)। এই সময়ের মধ্যে যে ব্যক্তি আরাফাতে অবস্থান করলে সেটি আরাফাতে অবস্থান বলে গণ্য হবে।

প্রশ্ন (২৫) : মুযদালিফাতে রাত্রি যাপন করে সেখান থেকে কখন রওয়ানা হতে হবে?

-রাসেল মাহমূদ
টাঙ্গাইল।

উত্তর : মুযদালিফাতে রাত্রি যাপন করে সেখানেই ফজরের ছালাত আদায় করে সূর্য উদয় হওয়ার আগেই সেখান থেকে রওয়ানা করবে। জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর দীর্ঘ হাদীছে রয়েছে, অতঃপর ভোর হয়ে গেলে তিনি আযান ও ইক্বামতসহ ফজরের ছালাত আদায় করলেন। অতঃপর কাসওয়ার পিঠে আরোহণ করে ‘মাশআরুল হারাম’ নামক স্থানে আসলেন। এখানে তিনি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর নিকট দু‘আ করলেন, তার মহত্ব বর্ণনা করলেন, কালিমা তাওহীদ পড়লেন এবং তার একত্ব ঘোষণা করলেন। দিনের আলো যথেষ্ট উজ্জ্বল না হওয়া পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়ে এরূপ করতে থাকলেন (ছহীহ মুসলিম, হা/১২১৮; আবূ দাঊদ, হা/১৯০৫)। উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুশরিকরা সূর্য না উঠা পর্যন্ত রওয়ানা হতো না। তারা বলত, হে সাবীর! আলোকিত হও। আর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিপরীত করলেন এবং তিনি সূর্য উঠার আগেই রওয়ানা হলেন (ছহীহ বুখারী, হা/১৬৮৪)।

প্রশ্ন (২৬) : মাথা মুণ্ডন করা উত্তম নাকি মাথার চুল ছোট করাই বেশি উত্তম?

-আখতার হোসেন
পটুয়াখালী।

উত্তর : পুরুষদের জন্য মাথা মুণ্ডন করাই উত্তম। কেননা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটি করেছেন, আর তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'হে আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীদেরকে ক্ষমা করুন'। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! চুল খাটোকারীদের (ক্ষমার জন্য দু'আ করুন)। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীদের ক্ষমা করুন'। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! চুল খাটোকারীদেরও। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীদের মাফ করুন'। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! চুল খাটোকারীদেরও। তিনি বললেন, 'চুল খাটোকারীদেরও (ক্ষমা করুন)' (ছহীহ বুখারী, হা/১৭২৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১৩০২)। আর মহিলাদের জন্য চুল খাটো করা উত্তম। কেননা ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নারীদের মাথার চুল মুণ্ডন করার প্রয়োজন নেই। বরং তারা চুল কাটবে' (আবূ দাঊদ, হা/১৯৮৪; ত্বাবারানী কাবীর, হা/১৩০১৮)।

প্রশ্ন (২৭) : মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে উমরা করা যাবে কি?

-সাজেদুল ইসলাম
রাজশাহী।

উত্তর : মৃতের পক্ষ থেকে হজ্জ বা উমরা করা যাবে। বুরায়দা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দরবারে বসেছিলাম। তখন এক মহিলা তাঁর কাছে উপস্থিত হলো। সে নিবেদন করল, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি মাকে আমার একটি বাঁদী ছাদাক্বা হিসেবে দান করেছিলাম। আমার মা মৃত্যুবরণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমার ছওয়াব তো প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এখন মীরাছ (আইন) তোমাকে বাঁদীটি ফেরত দিয়েছে'। মহিলাটি আবার বলল, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার মায়ের উপর এক মাসের ছিয়াম (ফরয) ছিল। আমি কি তা তার পক্ষ থেকে আদায় করে দেব? তিনি বলেন, 'তার পক্ষ থেকে আদায় করবে'। মহিলাটি পুনরায় বলল, আমার মা কখনো হজ্জ পালন করেননি। আমি কি তার পক্ষে হজ্জ আদায় করব? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ। তুমি তার হজ্জ আদায় করে দাও' (ছহীহ মুসলিম, হা/১১৪৯)। তবে বদলী হজ্জ আদায়কারী ব্যক্তিকে তার নিজের হজ্জ আগে আদায় করতে হবে। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, লাব্বাইকা আন শুবরুমা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'শুবরুমা কে? লোকটি বলল, আমার ভাই কিংবা আমার বন্ধু। তিনি বললেন, 'তুমি কি নিজের হজ্জ করেছ? সে বলল, না। তিনি বললেন, 'প্রথমে তোমার নিজের হজ্জ আদায় করে নাও, তারপর শুবরুমার পক্ষ থেকে হজ্জ করো' (আবূ দাঊদ, হা/১৮১১)।

প্রশ্ন (২৮) : আরাফার মাঠে যোহর ও আছর ছালাত জমা ও ক্বছর করতে হবে মর্মে দলীল জানতে চাই।

-নাঈম ইসলাম
দিনাজপুর।

উত্তর : রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ছাহাবায়ে কেরাম আরাফার মাঠে যোহর ও আছর ছালাত জমা ও ক্বছর করে পড়েছেন একথাই সঠিক। ইবনু শিহাব রাহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে সালেম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, যে বছর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু -এর বিরুদ্ধে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে মক্কায় পৌঁছেন, (আমার পিতা) আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন,'আরাফার দিনে আরাফার ময়দানে আমরা হজ্জের কাজ কীভাবে সম্পন্ন করব? সালেমই (তাৎক্ষণিক) বলেন, আপনি যদি সুন্নাতের অনুসারী হয়ে করতে চান, তাহলে আরাফার দিন সকালে শীঘ্র ছালাত আদায় করবেন যোহর ও আছর এক সাথে তথা যোহরের প্রথম সময়ে। তখন (আমার পিতা) ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বললেন, সে সালেম সঠিক বলেছে, কেননা ছাহাবীগণ সুন্নাত অনুসারে যোহর ও আছর একত্রে ছালাত আদায় করতেন।

রাবী ইবনু শিহাব বলেন, আমি সালেমকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কি এটা করেছেন? তখন সালেম রাহিমাহুল্লাহ বললেন, তাঁরা কি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত ব্যতীত অন্য কিছুর অনুসরণ করতেন? অর্থাৎ করতেন না। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا অর্থাৎ হে আল্লাহ, সাক্ষী থাক! হে আল্লাহ, সাক্ষী থাক! তিনবার বললেন, অতঃপর বেলাল আযান দিলেন। অতঃপর ইক্বামত দিয়ে যোহরের ছালাত আদায় করলেন অতঃপর আবার ইক্বামত দিয়ে আছরের ছালাত আদায় করলেন এবং এর মাঝে তিনি অন্য কোনো ছালাত আদায় করেননি’ (ছহীহ বুখারী, হা/১৬৬২; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হা/৪৪২০)। অর্থাৎ যোহরের সময় আযান দেয়ার পর ইক্বামত দিয়ে যোহর দুই রাকআত পড়ে সালাম ফিরাবে। অতঃপর ইক্বামত দিয়ে আছর দুই রাকআত পড়বে। আরাফায় অবস্থানকালীন আর কোনো ছালাত নেই।

প্রশ্ন (২৯) : কারো ওপর হজ্জ ফরয থাকলে, সে যদি শুধু উমরা করে, তাহলে কি তার থেকে হজ্জ মাফ হয়ে যাবে?

-আবূ সুফিয়ান
ফেনী।

উত্তর : না, তার থেকে হজ্জ মাফ হবে না। কেননা হজ্জ ও উমরা হলো দুটি পৃথক ইবাদত, যাতে একটি করলে আরেকটি আদায় হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তোমরা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও উমরা পূর্ণ করো’ (আল-বাকারা, ২/১৯৬)। আবূ রযীন আল উকাইলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি একবার নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমার পিতা খুবই বৃদ্ধ, হজ্জ ও উমরা করার সামর্থ্য রাখে না এবং বাহনে বসতে পারেন না। তিনি ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘তুমি তোমার পিতার পক্ষ হজ্জ ও উমরা করো’ (আবূ দাঊদ, হা/১৮১০; ইবনু মাজাহ, হা/২৯০৬)। সুতরাং উমরা করলেও সামর্থ্য থাকলে তাকে অবশ্যই হজ্জ করতে হবে।

কুরবানী

প্রশ্ন (৩০) : কুরবানী দেওয়া সুন্নাত নাকি ফরয? সামর্থ্য থাকার পরেও কেউ কুরবানী না করলে সে পাপী হবে কি?

-আয়নাল হক
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : কুরবানী দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘হে লোকসকল! নিশ্চয়ই প্রতিটি পরিবারের লোকদের ওপর প্রতি বছর কুরবানী করা কর্তব্য’ (আবূ দাঊদ, হা/২৭৮৮; তিরমিযী, হা/১৫১৮)। তবে সামর্থ্য থাকার পরেও কেউ কুরবানী না করলে সে পাপী হবে না। আবূ সারীহা (অর্থাৎ হুযায়ফা ইবনু উসাইদ আল-গিফারী) রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আবূ বকর এবং উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তারা মাঝে মাঝে কুরবানী দিতেন না, লোকেরা তাদের অনুসরণ করে কুরবানী দেয়া যরূরী মনে করবে তাই’ (বায়হাক্বী, হা/৯/২৯৫; ইরওয়াউল গালীল, ৪/৩৫৫)। আবূ মাসঊদ আল-আনছারী রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেছেন, সামর্থ্য থাকার পরেও আমি কুরবানী দেয় না এই আশঙ্কায় যে, আমার প্রতিবেশীগণ হয়ত মনে করবে কুরবানী দেয়া আমার জন্য যরূরী (ইরওয়াউল গালীল, ৪/৩৫৫ পৃ.)।

প্রশ্ন (৩১) : কত হিজরীতে কুরবানীর প্রচলন শুরু হয়?

-পারভেজ হাসান
রংপুর।

উত্তর : কুরবানীর ইতিহাস খুবই প্রাচীন। পৃথিবীর ইতিহাসে আদম আলাইহিস সালাম-এর পুত্রদ্বয় হাবীল ও ক্বাবীলের কুরবানী করার মাধ্যমে যার সূচনা হয় (আল-মায়েদা, ৫/২৭)। তবে বর্তমানে আমরা যে কুরবানীর সাথে পরিচিত তা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর আদর্শ হিসাবে অনুসরণীয় এবং অনুকরণীয় (আছ-ছাফফাত, ৩৭/১০০-১১১)। ২য় হিজরীতে সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে যার পুনঃপ্রচলন শুরু হয় (সুবুলুস সালাম, ২/৭০)।

সূচিপত্র

প্রশ্ন (৩২) : কুরবানী করার সময় কয়দিন?

-রাকিব হাসান
ময়মনসিংহ।

উত্তর : কুরবানী করার সময় হলো মোট চার দিন। কুরবানীর দিন এবং তার পরের তিন দিন। জুবাইর ইবনু মুত্বইম রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'পুরো আরাফাতই অবস্থানস্থল। তাই তোমরা বাতনে উরানাহ থেকে উঠে যাও। আর পুরো মুযদালিফাই অবস্থানস্থল। তাই তোমরা বাতনে মুহাসসির থেকে উঠে যাও। আর মিনার প্রতিটি গিরিপথই কুরবানীর স্থান। আর আইয়্যামে তাশরীকের প্রতিটি দিনই কুরবানী করার দিন' (ইবনু হিব্বান, হা/৪০৯৭; সুনানুল কুবরা বায়হাক্বী, হা/১৯২৪১)।

প্রশ্ন (৩৩) : কুরবানীর পশু ঈদগাহে যবেহ করতে হবে, না নিজ বাড়ীতে যবেহ করতে হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : কুরবানীর পশু ঈদগাহে যবেহ করাই উত্তম। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঈদগাহে কুরবানী করতেন (ছহীহ বুখারী, হা/৫৫৫২)। তবে ঈদগাহ ব্যতীত অন্যত্রও কুরবানী করা যায়।

প্রশ্ন (৩৪) : ভাগে কুরবানী দেয়া যাবে কি?

-আতাউর রহমান
চাপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : মালিকানার ভিত্তিতে একজনের পক্ষ থেকে একটি পরিপূর্ণ প্রাণ কুরবানী হবে এটাই উত্তম বা কুরবানীর মৌলিক বিধান। প্রাণীর মালিক নেকীতে তার পরিবারকে শরীক করতে পারেন। কিন্তু মালিকানার ভিত্তিতে একটি কুরবানীর সাতজন মালিক হবেন এবং তাদের পক্ষ থেকে গণ্য হবে এমনটি কুরবানীর স্বাভাবিক মৌলিক সুন্নাত নয়। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে শুধু গরু ও উটের ক্ষেত্রে এবং হজ্জের সফরে এমনটি করতে দেখা গেছে। সেক্ষেত্রে তারা তাদের পরিবারকে নেকীতে শরীক করেছিলেন কি-না এই বিষয়ে স্পষ্ট কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই আমাদের চেষ্টা করতে হবে প্রতি সক্ষম ব্যক্তির পক্ষ থেকে একটি কুরবানী করার এবং তারা নেকীতে তাদের পরিবারকে শরীক করবে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'হে লোকসকল! নিশ্চয়ই প্রতিটি পরিবারের লোকদের ওপর প্রতি বছর কুরবানী করা কর্তব্য' (আবূ দাঊদ, হা/২৭৮৮; তিরমিযী, হা/১৫১৮)। তবে নিতান্তই কেউ প্রয়োজন মনে করলে গরুতে সাতজন অংশগ্রহণ করতে পারে। জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুদাইবিয়ার বছর আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সাথে প্রতি সাতজনের পক্ষ থেকে একটি উট এবং প্রতি সাতজনের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী করেছি (ছহীহ মুসলিম, হা/১৩১৮; আবূ দাঊদ, হা/২৮০৯)।

প্রশ্ন (৩৫) : কুরবানীদাতা ক্বিয়ামতের মাঠে কুরবানীর পশুর লোম, শিং ও ক্ষুর নিয়ে উপস্থিত হবে। একথা কি ঠিক?

-ফাহিম
গাজীপুর।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ (তিরমিযী, হা/১৪৯৩; ইবনু মাজাহ, হা/৩১২৬)। এছাড়া উক্ত হাদীছ কুরআনের আয়াতের বিরোধী। আল্লাহ বলেন, 'কুরবানীর গোশত ও রক্ত আল্লাহর নিকটে পৌঁছে না; বরং তোমাদের তাক্বওয়া আল্লাহর নিকট পৌঁছে' (আল-হজ্জ, ২২/৩৭)।

প্রশ্ন (৩৬) : একই পশুতে কুরবানী ও আক্বীক্বা করা যাবে কি?

-সাকিবুর রহমান
খুলনা।

উত্তর : কুরবানী ও আক্বীক্বা দুটি পৃথক বিধান। একই পশুতে কুরবানী ও আক্বীক্বা দেওয়ার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বা ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এ ধরনের আমলের অস্তিত্ব ছিল না (নায়লুল আওত্বার, ৬/২৬৮)। সুতরাং এমনটি করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন (৩৭) : ছেলে সন্তানের জন্য দুটি ছাগলে আক্বীক্বা দিতে হয়। কিন্তু সামর্থ্য না থাকলে একটি ছাগল দেয়া যাবে কি?

-আসাদুল্লাহ
রংপুর।

উত্তর : যাবে। আলী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম হাসান রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর পক্ষ থেকে একটি ছাগল আক্বীক্বা দিয়েছিলেন এবং কন্যা ফাতেমাকে বলেছিলেন, 'হাসানের মাথার চুলের ওযনের সমান রূপা ছাদাক্বা করো' (তিরমিযী, হা/১৫১৯)।

প্রশ্ন (৩৮) : পশুর এক চোখ কানা ও এক চোখ ভালো হলে সে পশু দ্বারা কুরবানী হবে কি?

-রাশেদ রায়হান
রাজশাহী।

উত্তর : না, এমন পশু দ্বারা কুরবানী বৈধ হবে না। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'খোঁড়া জন্তু যার খোঁড়ামী স্পষ্টভাবে প্রকাশিত, অন্ধ পশু যার অন্ধত্ব স্পষ্টভাবে প্রকাশিত, রুগ্ন পশু যার রোগ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত এবং দুর্বল ও ক্ষীণকায় পশু যার হাড়ের মজ্জা পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে এ ধরনের পশু দ্বারা কুরবানী করা যাবে না ' (আবূ দাঊদ, হা/২৮০২; তিরমিযী, হা/১৪৯৭)।

প্রশ্ন (৩৯) : কুরবানীর পশু যবেহ করার জন্য ইমামকে যে গোশত বা অর্থ দেওয়া হয় তা কি হালাল হবে?

-সাব্বির হাসান
জামালপুর।

উত্তর : কুরবানীর গোশত থেকে কাউকে পারিশ্রমিক হিসাবে কিছু দেওয়া যাবে না। আলী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে তার কুরবানীর পশুর পাশে দাঁড়াতে, এগুলোর গোশত, চামড়া ও পিঠের আবারণসমূহ বিতরণ করতে নির্দেশ দেন এবং তা হতে কসাইকে যেন পারিশ্রমিক হিসাবে কিছুই দেওয়া না হয় (ছহীহ বুখারী, হা/১৭১৭)। তবে ঐ ব্যক্তিকে কিছু পারিশ্রমিক দেওয়া যেতে পারে (আল-মুগনী ১১/১০)।

প্রশ্ন (৪০) : যিলহজ্জের চাঁদ উঠলে কুরবানীদাতা ছাড়া পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা কি নখ, চুল ইত্যাদি কাটতে পারবে?

-খোকন মাহমূদ
ঢাকা।

উত্তর : পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা নখ-চুল কাটতে পারে। কেননা যাদের কুরবানী নেই তারাও নখ, চুল কাটা থেকে বিরত থাকবে এবং কুরবানীর দিন কাটলে পূর্ণ নেকী পাবে মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তা যঈফ (আবূ দাঊদ, হা/২৭৮৯; নাসাঈ, হা/৪৩৬৫)। উক্ত হাদীছের উপর আমল করা যাবে না।

প্রশ্ন (৪১) : একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ কতটি পশু কুরবানী করতে পারে?

-হৃদয় খান শান্ত
সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : একটি পরিবারের পক্ষ থেকে একটি কুরবানী করাই যথেষ্ট। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'হে লোকসকল! নিশ্চয়ই প্রতিটি পরিবারের লোকদের ওপর প্রতি বছর কুরবানী করা কর্তব্য' (আবূ দাঊদ, হা/২৭৮৮; তিরমিযী, হা/১৫১৮)। তবে সামর্থানুপাতে একাধিক পশুও কুরবানী করতে পারে। আনাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুটি শিংওয়ালা সাদা-কালো রঙের ভেড়া কুরবানী করতেন (ছহীহ বুখারী, হা/৫৫৬৪, ৫৫৬৫)। অপর বর্ণনায় আছে, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম একসাথে একশটি উট কুরবানী করেছেন (ছহীহ মুসলিম, হা/১২১৮; ইবনু মাজাহ, হা/৩০৭৪)।

প্রশ্ন (৪২) : টাকা ধার নিয়ে কুরবানী দেওয়া যাবে কি?

-আশরাফুল ইসলাম
সাতক্ষীরা।

উত্তর : কুরবানী আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম। বছরে মাত্র একবার কুরবানী দেওয়ার সুযোগ আসে। তাই যথাসাধ্য কুরবানী দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত। ঋণ ব্যতীত কুরবানী দেওয়ার সামর্থ্য না থাকলে এবং মাসিক বেতন কিংবা অন্য কোনো মাধ্যমে ঋণ পরিশোধ করার উপায় থাকলে ঋণ করে কুরবানী করাতে শারঈ কোনো বাধা নেই (মাজমূউল ফাতাওয়া লি-ইবনু তায়মিয়াহ, ২৬/৩০৫)।

প্রশ্ন (৪৩) : কুরবানীর পশু ক্রয়ের পর যদি তা গাভীন প্রমাণিত হয় তাহলে তা দ্বারা কুরবানী করা যাবে?

-জিল্লুর রহমান
পাবনা।

উত্তর : হ্যাঁ, যাবে। এতে শারঈ কোনো বাধা নেই। যবেহ করার পর তার পেটের বাচ্চাটি যদি জীবিত পাওয়া যায় তাহলে রুচি হলে সেটাও যবেহ করে খাওয়া যেতে পারে। এমনকি মৃত অবস্থায় পাওয়া গেলে তার মায়ের যবেহ বাচ্চার যবেহ বলে গণ্য হবে। আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলাম প্রাণীর পেটের বাচ্চা সম্পর্কে। মুসাদ্দাদের বর্ণনায় আছে, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমরা উটনী, গাভী কিংবা বকরী যবেহ করতে গিয়ে তার পেটে বাচ্চা পাই। সেটা কি আমরা ফেলে দিব, না খাব? তিনি বললেন, 'মনে চাইলে খাও। কারণ তার মায়ের যবেহটাই তার যবেহ বলে গণ্য' (আবূ দাঊদ, হা/২৮২৭)।

বিবাহ ও তালাক

প্রশ্ন (৪৪) : স্বামী সংসার করতে আগ্রহী কিন্তু স্ত্রী সংসার করতে আগ্রহী না। এই অবস্থায় স্ত্রী যদি বাপের বাড়ী চলে যায় তাহলে কি তার দেনমোহর পরিশোধ করা লাগবে?

-হুযায়ফা
রাজারহাট, কুড়িগ্রাম।

উত্তর : প্রথমত, বিবাহের যে সকল শর্ত পূরণ করা অগ্রাধিকারযোগ্য বিষয় তার অন্যতম হলো মোহর (ছহীহ বুখারী, হা/৫১৫১; ছহীহ মুসলিম, হা/১৪১৮)। তাই বিয়ের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মোহর আদায় করে দেওয়া কর্তব্য। একারণে পাত্রের সামর্থানুযায়ীই মোহর নির্ধারণ করতে হবে। সামর্থের অতিরিক্ত নয়। দ্বিতীয়ত, বিবাহের মোহর যদি নির্ধারিত করা হয়ে থাকে এবং স্বামী স্ত্রীর মাঝে সহবাস হলেই স্ত্রী মোহরের হক্বদার হয়ে যায়। তৃতীয়ত, স্ত্রী যদি সংসার করতে না চায়, তাহলে তাকে খোলা তালাক নিতে হবে। এক্ষেত্রে তাকে স্বামীর পক্ষ থেকে পাওয়া মোহর, গয়না অলংকার, অর্থ সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে হবে। তবে যদি সম্পূর্ণ ফিরিয়ে দিতে না চায়, তাহলে যতটুকুতে তারা একমত হবে, ততটুকু ফিরিয়ে দিয়েও খোলা করা যায়। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ছাবেত ইবনু কায়স ইবনু শাম্মাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর স্ত্রী নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি ছাবেতের দ্বীন ও চরিত্রের ব্যাপারে কোনো দোষ দিচ্ছি না। তবে আমি কুফরীর আশঙ্কা করছি। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি তার বাগানটি ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত আছ? সে বলল, হ্যাঁ। অতঃপর সে বাগানটি তাকে (স্বামীকে) ফিরিয়ে দিল। আর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্বামীকে নির্দেশ দিলেন, সে মহিলাকে পৃথক করে দিল (ছহীহ বুখারী, হা/৫২৭৬)।

প্রশ্ন (৪৫) : সৎবোন বা সৎভাইয়ের নাতনিকে বিবাহ করা যাবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
পাবনা।

উত্তর : না, সৎবোন বা সৎ ভাইয়ের নাতনিকে বিবাহ করা যাবে না। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা, মেয়ে, বোন, ফুফু, খালা, ভাইয়ের মেয়ে, বোনের মেয়ে.. (আন-নিসা, ৪/২৩)। এখানে ভাইয়ের মেয়ের মধ্যে এবং বোনের মেয়ের মধ্যে সেই মেয়েদের মেয়েরাও অন্তর্ভুক্ত, এভাবেও যতই নিচে যাওয়া যায়, তারাও এর অন্তর্ভুক্ত (তাফসীরুল মানার, ৪/৩৮৩; তাফসীর আস-সাদী, ১৭৩)। সুতরাং সৎ বোন বা সৎ ভাইয়ের নাতনিকে বিবাহ করা যাবে না।

প্রশ্ন (৪৬) : একজনের বিবাহিত স্ত্রী হয়ে থাকা অবস্থায় অন্যের সাথে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে বৈধ কি?

-সাইফুল ইসলাম
রাজশাহী।

উত্তর : বৈধ নয়; মহান আল্লাহ যে সকল মহিলাকে বিবাহ করা হারাম বলেছেন, তার মধ্যে একজন হলো বিবাহিত মহিলা, যে কোনো স্বামীর বিবাহ বন্ধনে বর্তমানে সংসার করছে এবং তালাক হয়নি। মহান আল্লাহ বলেন,

‘নারীদের মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তোমাদের জন্য এ হলো আল্লাহর বিধান। উল্লিখিত নারীগণ ব্যতীত আর সকলকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো। এই শর্তে যে, তোমরা তাদের নিজ সম্পদের বিনিময়ে বিবাহের মাধ্যমে গ্রহণ করবে, অবৈধ যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে নয়’ (আন-নিসা, ৪/২৪)। সুতরাং একজনের স্ত্রী থাকা অবস্থায় অন্যের সাথে বিবাহ বন্ধন শুদ্ধ হবে না।

প্রশ্ন (৪৭) : স্বামী বা স্ত্রীর কোনো একজন মুরতাদ হয়ে গেলে কি তাদের বিবাহ বলবৎ থাকবে?

-জয়নাল আহমেদ
কুমিল্লা।

উত্তর : স্বামী বা স্ত্রীর কেউ মুরতাদ হয়ে গেলে তাদের বিবাহ আর বলবৎ থাকবে না, বরং বিবাহ বন্ধন নষ্ট হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘অতঃপর যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা মুমিনা নারী, তবে তাদেরকে কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ো না। মুমিন নারীগণ কাফিরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফিররা মুমিন নারীদের জন্য বৈধ নয়’ (আল-মুমতাহিনা, ৬০/১০)।

হালাল-হারাম

প্রশ্ন (৪৮) : স্কুল থেকে জন্ম তারিখ কমিয়ে দেওয়ার কারণে সরকারি চাকুরিতে আবেদনের বয়স বৃদ্ধি পায়। এখন এই বয়স বৃদ্ধির সার্টিফিকেট দিয়ে চাকরি করা জায়েয হবে কি?

-মো. আব্দুর রহমান
টাংগাইল

উত্তর : জন্ম তারিখ কমিয়ে দেওয়া ইসলামে বৈধ নয়। আর এমন জন্ম তারিখ কমানো সার্টিফিকেট দিয়ে চাকরি করাও জায়েয নয়। কেননা এটি ধোকার শামিল। আর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি ধোকা দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়’ (ছহীহ মুসলিম, হা/১০১)। সুতরাং সকল সার্টিফিকেটে জন্ম তারিখ পরিবর্তন করার উদ্যোগ নিতে হবে। অথবা সার্টিফিকেটের বয়স অনুযায়ী বিশেষ কোনো সুবিধা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। বরং সকল সুযোগ সুবিধা নিজের প্রকৃত বয়সকে হিসেবে রেখে গ্রহণ করার চেষ্টা করতে হবে।

হাদীছ

প্রশ্ন (৪৯) : ‘হাফেযদের পিতামাতাকে ক্বিয়ামতের দিন নূরের টুপি পরানো হবে’-কথাটি কি ঠিক?

-আরিফুল ইসলাম
নওগাঁ।

উত্তর : কথাটি ঠিক নয়। তাছাড়া কুরআন অধ্যয়নকারী ও তদানুযায়ী আমলকারীর পিতামাতাকে মুকুট পরানো হবে মর্মে মুসনাদে আহমাদ, ও আবূ দাঊদে বর্ণিত হাদীছটি নিতান্তই যঈফ (মুসনাদে আহমাদ, হা/১৫৬৮৩; আবূ দাঊদ, হা/১৪৫৩)।

সীরাত

প্রশ্ন (৫০) : নবী ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর মাথার চুল কেমন ছিল?

-নজরুল ইসলাম
রাজশাহী।

উত্তর : নবী ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর মাথার চুল ছিল মধ্যম ধরনের, যা খুব বেশি কোকড়ানোও ছিল না, আবার একেবারে সোজাও ছিল না। আনাস রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর মাথার চুল উভয় কানের মধ্যবর্তী স্থান পর্যন্ত পৌঁছত। অন্য বর্ণনায় আছে, তাঁর চুলগুলো উভয় কান ও কাঁধের মাঝামাঝিতে ছিল (ছহীহ বুখারী, হা/৩৫৪৮; ছহীহুল জামে, হা/৪৬৩৫)। বারা ইবনু আযেব রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর চুল তাঁর দুই কানের লতি পর্যন্ত পৌঁছত (ছহীহ বুখারী, হা/৩৬৫১)।

সদ্য প্রকাশিত

কেন হব অবরোধবাসিনী ?
উম্মে মারিয়াম রাযিয়া বিনতে আযীযুর রহমান

■ পৃষ্ঠা : ২৪০ ■ মূল্য : ১৪০ টাকা

সদ্য পরিমার্জিত

শিক্ষা বনাম জাহিলিয়াত
উম্মে মারিয়াম রাযিয়া বিনতে আযীযুর রহমান

■ পৃষ্ঠা : ১৬৮ ■ মূল্য : ৯০ টাকা

হজ্জ ও উমরা
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

■ পৃষ্ঠা : ১২৮ ■ মূল্য : ৯০ টাকা

আইনে রাসুল (ছা:) দু'আ অধ্যায়
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

■ পৃষ্ঠা : ২০৮ ■ মূল্য : ১৩০ টাকা

পোশাক
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

■ পৃষ্ঠা : ৯৬ ■ মূল্য : ৭৫ টাকা

উপদেশ
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

■ পৃষ্ঠা :৪৫৬ ■ মূল্য :২৫০ টাকা

রাসুল (ছা.)-এর ছালাত বানাম প্রচিলিত ছালাত
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

■ পৃষ্ঠা : ৩৯২ ■ মূল্য : ২২০ টাকা

এছাড়াও তুবা পাবলিকেশনের অন্যান্য বই পেতে যোগাযোগ করুন

তুবা পাবলিকেশন TUBA PUBLICATION

রাজশাহী নওদাপাড়া (আমচত্বর), সপুরা, রাজশাহী
মোবাইল : ০১৩০১-৩৯৬৮৩৬

বাংলাবাজার গিয়াস গার্ডেন মার্কেট, নর্থব্রুক হল রোড, ৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল : ০১৪০৭-০২১৮৫০

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর সমূহ

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ জেনারেল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৭০১
বিকাশ, নগদ নং- ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ (পারসোনাল)

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রমের জন্য
বায়তুল হামদ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৩১৬
বিকাশ নং- ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ (মার্চেন্ট)

পত্রিকা ও বই ফ্রি বিতরণ এবং দাঈ নিয়োগসহ বিভিন্ন দাওয়াহ কার্যক্রমের জন্য
আল-ইতিছাম দাওয়াহ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৮০২
বিকাশ নং- ০১৭৯৩-৬৩৮১৮০ (এজেন্ট)

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রমের জন্য
নিবরাস ইয়াতিম কল্যাণ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৬০০
নগদ নং- ০১৪০৭-০২১৮০০ (পারসোনাল)
রকেট নং- ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ (পারসোনাল)
বিকাশ নং- ০১৯০৪-১২২৫৪৬ (এজেন্ট)

মানবসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য
নিবরাস ত্রাণ তহবিল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৯০৩
বিকাশ, নগদ ও রকেট নং- ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮ (পারসোনাল)

যাকাতের জন্য
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ যাকাত ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৪১৭
বিকাশ নং- ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ (পারসোনাল)

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বীরহাটাব-হাটাব, বীরাব, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
নারায়ণগঞ্জ শাখা : বীরহাটাব-হাটাব, বীরাব, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮, ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
রাজশাহী শাখা : ডাঙ্গীপাড়া, পবা, শাহ্মখদুম, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৪০৭-০২১৮২২, ০৯৬৭৮৭৭১৬৬২

Monthly Al-Itisam الاعتصام 7th Year, 8th Part, June 2023, Price : 30.00

মাদরাসা তারবিয়াতুল বানাত

MADRASAH TARBIATUL BANAAT

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে বিশুদ্ধ আক্বীদাহ ও ইসলামী জ্ঞানার্জনসহ আদর্শ মুসলিম নারী গড়ার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত

মহিলা মাদরাসা

হিফয ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগ

▪ আবাসিক ▪ অনাবাসিক ▪ ডে-কেয়ার

ছাত্রী ভর্তি চলছে

▪ প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ▪

শাইখ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন সালাফী

৭৯/০২/জি, বিবির বাগিচা ০৩ নং গেইট, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।
(মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া সংলগ্ন ইবনে সিনা গলি)

০১৭১৩ ৮৬৩৪৯০, ০১৮৫৯ ৫৫৩৩৫৫

মাকতাবাতুস সালাফ কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত

সিলসিলা ছহীহা!

(সিলসিলাতুল আহাদীছিছ ছহীহা)

সিলসিলা ছহীহার হাদীছসমূহ তাখরীজ ছাড়া ফিক্বহী ধারায় বিন্যস্ত

মূল : আল্লামা মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ

▪ পৃষ্ঠা : ৫১২ ▪ মূল্য : ৫০০ টাকা

ওহে সুন্নাহর অনুসারীগণ! পরস্পরের প্রতি কোমল হোন

আল্লামা শাইখ আব্দুল মুহসিন ইবনু হামাদ আল আব্বাদ আল বাদ্‌র হাফিযাহুল্লাহ

সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

▪ পৃষ্ঠা : ১০৪ ▪ মূল্য : ১০০ টাকা

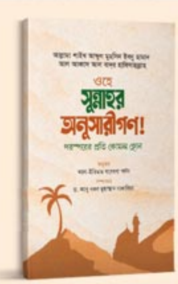

আল্লাহ যাদের সাথে পরকালে কথা বলবেন না

সাঈদুর রহমান

সম্পাদনা: আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ

▪ পৃষ্ঠা : ৬৪ ▪ মূল্য : ৬০ টাকা

মাকতাবাতুস সালাফ

সার্বিক যোগাযোগ : মাকতাবাতুস সালাফ
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৪০৭-০২১৮৪৭